ইসলামে
মসজিদের
ভূমিকা
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

ইসলামে মসজিদের ভূমিকা

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৮৯

২য় প্রকাশ

সফর	১৪২৫
বৈশাখ	১৪১১
এপ্রিল	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAM-A MASJIDER VHUMIKA by A. N. M. Shirajul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 50.00 Only.

সূচীপত্র

কেন এই বই?

আমাদের মসজিদগুলো কি মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং জেরুসালেমের মসজিদে আকসা কিংবা পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে? ঐসকল মসজিদগুলোর ভূমিকা কি ছিল? আমাদের সমাজের মসজিদগুলোর ভূমিকার সাথে ঐসকল মসজিদের ভূমিকার কি পার্থক্য?

এক মসজিদে নববীই গোটা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। অথচ আজকে বাংলাদেশে আড়াইলাখ মসজিদসহ গোটা দুনিয়ায় ৫০টিরও অধিক মুসলিম রাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশে প্রায় এক কোটির মত মসজিদ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো নির্জীব ও প্রভাবহীন। সেগুলো আলোর খনি হওয়া সত্ত্বেও সমাজে অন্ধকার বিরাজ করছে। এক মসজিদে নববীর মত ভূমিকা পালন করলে, এক কোটি মসজিদ গোটা দুনিয়ায় ইসলামের কল্যাণের বন্যা বইয়ে দিতে পারে এবং জাহেলিয়াতকে চিরতরে বিদায় করে দিতে পারে। আজ তাই মসজিদের ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

মসজিদ হচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধন কেন্দ্র। এখান থেকেই ইলম ও আমল, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইসলামী দাওয়াত ও জিহাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আজকে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, মসজিদ শুধু এবাদতের স্থান। তাতে কি রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা জায়েয আছে? যদি জায়েয হয়, তাহলে, সেগুলো তো দুনিয়াবী কাজ। মসজিদে কি দুনিয়াবী কাজ জায়েয আছে?

উপরোক্ত জিজ্ঞাসার জবাবেই এ বই লেখার আয়োজন। বইটির সারমর্মের আলোকে আমাদের সমাজের মসজিদগুলোর পুনর্বিন্যাস আশু প্রয়োজন। বইটি যেন প্রত্যেক মুসলমানকে মসজিদের পুনর্জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে, এটাই একান্ত প্রার্থনা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মসজিদের গুরুত্ব ও লক্ষ্য

'সেজ্‌দাহ' থেকে 'মসজিদ' শব্দের উৎপত্তি। সেজ্‌দাহর অর্থ আল্লাহর দরবারে মাথা নত করা এবং ভূলুণ্ঠিত মস্তকে তাঁর হুকুম মানা। সেজ্‌দাহ নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আরবী শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়ম অনুযায়ী শব্দটি 'মাসজিদ' না হয়ে 'মাসজাদ' হওয়া দরকার ছিল। যেমন 'মাক্‌তাল'। কিন্তু 'মাসজিদ' হল কেন? অর্থাৎ 'জিমের' ওপরে 'জবর' না হয়ে নীচে 'যের' হল কেন? এই প্রশ্নের জওয়াবে বলা যায় যে, 'মাসজিদ' কেবল নামাযের জায়গাই নয়। শুধু নামাযের জায়গা হলে এটি হত 'মাসজাদ'। মূলত মাসজিদের অর্থ আরো ব্যাপক। এতে নামাযসহ আরো বহু কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। সেজন্য মসজিদ প্রথমদিন থেকেই আল্লাহর হক এবং বান্দার হকের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

পরিবারের পরেই মসজিদ হচ্ছে, ইসলামী সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। এটাকে মুসলিম সমাজের সামষ্টিক কেন্দ্রও বলা যেতে পারে। মসজিদ থেকেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিক নির্দেশ নিতে হবে। তাই মসজিদকে বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে হয়। মসজিদকে তার আকাংখিত ভূমিকা, পয়গাম ও কর্মসূচী থেকে খালি রাখলে তা প্রাণহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। ফলে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র এর কল্যাণ থেকে থাকবে বঞ্চিত।

রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় তিনটি প্রাথমিক ভিত্তির ওপর নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলো হচ্ছে, ১. মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা। ২. মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং ৩. মদীনা সনদ। সর্বোপরি, তিনি গোটা সমাজে কুরআন ও হাদীসের আইন চালু করেন। তিনি নিজেই ছিলেন সেই মসজিদ ও রাষ্ট্রের নেতা এবং আল্লাহর রসূল। বাস্তবে মসজিদ কি তা একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের দৈনিক সম্মেলন কেন্দ্র। দিন ও রাতে পাঁচবার নামাযের জন্য সেখানে তারা মিলিত হন।

অপরদিকে জুমাবার হচ্ছে, মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলনের দিন। কেননা, দৈনিক সম্মেলনের চাইতে সাপ্তাহিক সম্মেলনের পরিসর আরো বড় ও প্রশস্ত। সেদিন অপেক্ষাকৃত বেশী লোক এক স্থানে জড় হয়। কেননা,

অনেক ছোট মসজিদে জুমা হয় না। তাই সবাই বড় মসজিদগুলোতে আসার কারণে সেই সমাবেশটা বেশ বড় হয়। ইমাম সাহেব সবার উদ্দেশ্যে সময় ও প্রয়োজনের দাবী অনুযায়ী খোতবাহ বা বক্তৃতা করেন। এতে করে সবাই নেতা বা ইমাম থেকে সাপ্তাহিক উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পান।

পক্ষান্তরে, মুসলমানের বার্ষিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মক্কার মসজিদে হারামকে কেন্দ্র করে। হজ্জ ইসলামের ৫ম রোকন। সেই হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে। ৯ই জিলহজ্জ তাঁরা হজ্জ আদায় করেন।

এভাবে মসজিদ পাড়া ও মহল্লা থেকে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং শুধু জাতিগত ঐক্য নয় বরং আন্তর্জাতিক মুসলিম ঐক্য ও সংহতির পয়গাম বিতরণ করে; এর ফলে মসজিদ বিশ্বের সকল মুসলমানকে একই পরিবারভুক্ত করতে সক্ষম হয়। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ–

"মু'মিনরা একে অপরের ভাই। তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ করে দাও।" (আল–হুজুরাত–১০)

মসজিদ প্রসঙ্গে একজন কম্যুনিষ্ট নেতা মন্তব্য করেছিলেন, "যদি আমার কাছে লোকেরা দৈনিক পাঁচবার হাজির হয়, তাহলে, আমি গোটা দুনিয়াকে কম্যুনিষ্ট বানিয়ে দিতে পারবো।" (দৈনিক ওকাজ, জেদ্দা, ১৯৯০ খৃঃ)

কম্যুনিষ্ট নেতাটি মুসলমানের জীবনে মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই ঐ মন্তব্য করেছিলেন। ভেঙ্গে পড়া (সাবেক) সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যে কম্যুনিজম কায়েম হয়, মুসলমানরা কিছুতেই সেই কম্যুনিজমের সাথে নিজেদেরকে মিশিয়ে নিতে পারেনি। কম্যুনিষ্টরা গবেষণা চালিয়ে বুঝতে পারল যে, এর জন্য দায়ী হচ্ছে মসজিদ। তখন সেই নাস্তিক কম্যুনিষ্ট ঐ মন্তব্য করেন যা পরবর্তীতে মসজিদ সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।

আজকের মুসলিম দেশগুলো বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বাধীনতা লাভ করেছে। প্রায় দু' শতাব্দী যাবত মুসলিম দেশগুলো বৃটেন, ইটালী, হল্যান্ড ও ফরাসী উপনিবেশের অধীন ছিল। মুসলমানরা খৃষ্টান ঔপনিবেশিক শাসনামলে নিজেদের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, পরিচিতি ও আদর্শিক প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। ১৯ শতকের শেষদিকে, (১৮৮৩ খৃঃ) বৃটিশরা মিসর দখল করে।

অনুরূপভাবে, সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, নাইজেরিয়া ও অন্যান্য আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোসহ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ছিল খৃষ্টান উপনিবেশ।

বিংশ তাব্দীর শেষ দিকে এসে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্তি পেয়েছে উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিজিয়া ও তুর্কমেনিস্তান। আলবেনিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনা, শিশেন ও দাগিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতার অপেক্ষায় আছে আরো অনেক মুসলিম ভূখন্ড।

দীর্ঘ দু' শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অনৈসলামী ভাবধারার প্রভাব পড়ে। যার ফলে মসজিদও তার স্বকীয়তা এবং মৌলিক ভূমিকা হারিয়ে ফেলে। আজকের স্বাধীন পরিবেশে মসজিদের পুনর্জাগরণ কাম্য। এখন আমরা মসজিদের লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো। মসজিদের রয়েছে বহুমুখী লক্ষ্য ও ভূমিকা। সেগুলো হচ্ছে, [১]

১. মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা। বিভিন্ন কর্মসূচী, জ্ঞানচর্চা ও ইবাদাতের মাধ্যমে অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে তাকে লালন-পালন করা।

২. মুসলমানদের জীবনে রূহানী মূল্যবোধকে স্থায়ী করা। মসজিদে ইবাদাত ও রহমাতের (বেদআতমুক্ত) পরিবেশে আল্লাহর সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

৩. মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় করা। অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদের যাবতীয় তৎপরতা নিবদ্ধ থাকে।

৪. মুসলমানের জীবনে সহযোগিতা ও সহমর্মীতার ভাব সৃষ্টি করা। মসজিদে পরস্পর পরিচিতি লাভের পর একে অপরের সুখ-দুঃখে অংশ গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হয়।

৫. মুসলমানের জীবনে উন্নত চরিত্র ও উত্তম মানবীয় মৌলিক গুণাবলী সৃষ্টি করা। মসজিদে তাত্বিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও মানবতার মুক্তির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়।

---

১. রেসালাতুল মাসজিদ ফিল ইসলাম — ডঃ আবদুল আযীয মুহাম্মদ -রিয়াদ, প্রকাশ -১৯৮৭

৬. সর্বোত্তম উপায়ে মসজিদে ইবাদাত বন্দেগীর সুযোগ রয়েছে। মসজিদের দীনী ও নৈতিক পরিবেশের আধ্যাত্মিক ছোঁয়ায় গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহর ইবাদাত করা যায় যা অন্য কোন জায়গায় সম্ভবপর নয়।

৭. মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন করা। ইসলামী জীবন বিধানের আওতায় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা জরুরী। মসজিদ হচ্ছে, ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্র। মসজিদ থেকে যে সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হবে তা অন্য যে কোন সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার হবে। ইসলামী সংস্কৃতি বলতে, আচার-অভ্যাস, কৃষ্টি, আনন্দ উৎসবসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতির মডেলকে বুঝায়। মসজিদ সেগুলোকে জাহেলিয়াত তথা অনৈসলামী পদ্ধতি থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে।

৮. সমাজ সংস্কার মসজিদের অন্যতম লক্ষ্য। মানব সমাজে প্রচলিত মানুষের সৃষ্ট মতবাদ ও আমলের মাধ্যমে যে কুসংস্কার ও কুপ্রথা চালু হয় তা সমাজের গতিশীলতার জন্য বিরাট বাধা। সেই কুসংস্কারকে মোকাবিলা করতে না পারলে সমাজকে আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই মসজিদের শিক্ষার মাধ্যমে ঐসকল কুসংস্কার দূর করে সমাজে প্রগতির ধারা সৃষ্টি করা হয়।

৯. সমাজকল্যাণ মসজিদের একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্য ও অংশ। সমস্যাগ্রস্ত লোকদের সমস্যার সমাধান করে তাদেরকে সমাজে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করা জরুরী। সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজকর্ম কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মসজিদের রয়েছে সেই অপূর্ব সুযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার লোক ও মুসল্লীদের সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে গোটা সমাজ সমস্যামুক্ত হতে পারে।

১০. ওপরে বর্ণিত সকল লক্ষ্যের সফল বাস্তবায়নের জন্য জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন। মসজিদে ইসলামের জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সহজ। বরং জ্ঞান চর্চাকে সর্বাধিক বড় লক্ষ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

মসজিদ হচ্ছে, আল্লাহ প্রেমিকের আকুতি-মিনতির কেন্দ্র। তাই জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন,

"কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙ্গিনাতে,
আল্লাহর নাম জিকর করে লুকিয়ে গভীর রাতে।"

মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান হয়। মুয়াযযিনের আযানেরও রয়েছে সুললিত কণ্ঠস্বর। তাই একই কবি বলেছেন ঃ

'ও আযান ও কি পাপিয়ার ডাক,
কোকিলের কুহুতান,
মোআজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহবান।'

কবি জীবিত অবস্থায় যে আযানের সুললিত কণ্ঠে মুগ্ধ, তিনি মৃত্যুর পরেও তা শুনার জন্য আগ্রহী। তাই তিনি বলেছেনঃ

'মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেন গোরে থেকে ও মুআজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'

মসজিদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য

আল্লাহ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন ঃ

قُلْ اَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - (الاعراف : ٢٩)

"আপনি বলুন, আমার রব আমাকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন এবং তার আদেশ তো এই যে, তোমরা প্রত্যেক সেজদাহ তথা ইবাদাতে লক্ষ্য ঠিক রাখবে। তাকেই ডাক এবং নিজ দীনকে কেবলমাত্র তাঁর জন্যই এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর।" (আল-আ'রাফঃ ২৯)

এ আয়াতে, মসজিদ শব্দের উল্লেখ আছে। এখানে মসজিদ অর্থ ইবাদাত। অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا - (الجن : ١٨)

"মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না এবং শরীক করো না।" (সূরা জিন ঃ ১৮)

এ আয়াতে, মসজিদগুলোতে খালেস তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক উৎখাতের নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ لا يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ مِّ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ق لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

"আল্লাহ তাঁর ঘরসমূহের আদব ও সম্মান বৃদ্ধি এবং তাঁর নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐসকল মসজিদে সকাল ও সন্ধ্যায় লোকেরা

তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। ব্যবসা ও বেচা-কেনা তাদেরকে আল্লাহর যিকর, নামায কায়েম ও যাকাত থেকে গাফেল বা উদাসীন করতে পারে না। যেদিন অন্তর ও চোখ উল্টে যাবে, সেদিনকে তারা ভয় করে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজ বা আমলের উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাদেরকে নিজ করুণা থেকে আরো বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ যাকে চান, তাকে অগণিত রিযক দান করেন।" (সূরা নূর ঃ ৩৬-৩৮)

এই আয়াতসমূহে, মসজিদের সম্মান বৃদ্ধি করা এবং তাতে আল্লাহর স্মরণ ও সকাল সন্ধ্যায় নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে। যারা সত্যিকারের মুসলমান ও মুসল্লী, দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থলিপ্সা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে কিংবা নামায ও যাকাত থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা পরকালকে ভয় করে। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং অসংখ্য বা বে-হিসেব রিযক দেবেন। মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখার এটাই হচ্ছে, পুরস্কার।

আল্লাহ বলেন,

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

"মসজিদ আবাদ করা তথা তাতে ইবাদাত করার কোন অধিকার মোশরেকদের নেই।.... তারাই মসজিদে ইবাদাত করার অধিকার রাখে যারা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হবে।" (সূরা তাওবাহ ঃ ১৭-১৮)

আল্লাহ বলেন,

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -

"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা (সামর্থ অনুযায়ী) সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হও।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩১)

এখানে মসজিদ অর্থ ইবাদাত। মোশরেক ও কাফেররা উলঙ্গ কিংবা অর্ধোলঙ্গ হয়ে পূজা করত। আল্লাহ মোমেনদেরকে শুধু সতর ঢাকার নির্দেশই দেননি, বরং তিনি বলেছেন, সামর্থ অনুযায়ী সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে তোমরা ইবাদাতে হাজির হও।

মসজিদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এখন আমরা কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে মসজিদের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করবো।

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا –

"আল্লাহ আমার জন্য সমগ্র যমীনকে মসজিদ ও পবিত্র বানিয়ে দিয়েছেন।"

তাই যেকোন স্থানে নামাযসহ অন্য যে কোন ইবাদাত করা যাবে।

মসজিদের ফযীলত

এখন আমরা মসজিদের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করবো। এক হাদীসে এসেছে,

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا-

"আল্লাহর কাছে প্রিয়তম স্থান হচ্ছে, মসজিদ।"

আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য তাঁর প্রিয় স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

রসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنٰى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - (طبرانى)

"যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করেন।" (তাবরানী)

মসজিদ তৈরি করলে তার বিনিময়ে বেহেশত লাভ করা যাবে।

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, মসজিদগুলো যমীনে আমার ঘর। সেগুলোতে ইবাদাতকারীরা আমার যেয়ারতকারী। যে ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে আমার ঘরে এসে যেযারত করে, তার জন্য সুখবর; যেয়ারতকারী মেহমানকে সম্মান করা মেজবানের দায়িত্ব ও কর্তব।"[১]

এ হাদীসে মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতবেশী, তা পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে।

হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -

"আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি,যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

---

১. এেসালাতুল মাসজিদ ফিল ইসলাম- ডঃ আবদুল আযীয মোহাম্মদ - প্রকাশ- ১৯৮৭, বৈরুত।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنٰى بَيْتًا يَعْبُدُ اللّٰهَ فِيْهِ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَّيَاقُوْتٍ –

"রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হালাল অর্থ–সম্পদ দিয়ে একটি মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ বেহেশতে তার জন্য মূল্যবান মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর বিশিষ্ট একটি ঘর তৈরি করবেন।" (তাবরানী)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لَايُرِيْدُ بِهٖ رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ –

"যে ব্যক্তি লোক দেখানো কিংবা সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত একটি মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করবেন।" (তাবরানী)

এ সকল হাদীস দ্বারা মসজিদের মর্যাদা ও ফযীলত পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে যে, মুসলিম সমাজে মসজিদের প্রয়োজন কত বেশী।

রসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَّلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ –

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, সেটি যদি একটি ছোট পাখির বাসার মতও ছোট হয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করবেন।" (আল–হাদীস)

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সামর্থহীন লোকেরাও যেন মসজিদ তৈরির উদ্যোগ নেয়। স্বল্প ব্যয়ে ছোট মসজিদ তৈরি করলেও আল্লাহ এর বিনিময়ে বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ –

"আমার সামনে আমার উম্মাহর সওয়াব ও পুরস্কার পেশ করা হয়েছে, এমন কি যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করে, তার পুরস্কারও পেশ করা হয়েছে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খোযায়মাহ)

এ হাদীস দ্বারা আমরা মসজিদ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা ও এর পুরস্কারের কথা জানতে পারি। মসজিদ পবিত্রস্থান বলে এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও বিরাট সওয়াবের কাজ। তাই মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। কেউ থুথু ফেললে গুনাহর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে তা পুঁতে ফেলতে হবে কিংবা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

মসজিদের সাথে সম্পর্ককে ঈমানের চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ -

"তোমরা যদি কারো মধ্যে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস দেখ তাহলে, তার ঈমানের স্বাক্ষী দাও।" অর্থাৎ সে মোমেন।

এই হাদীসে মসজিদ ও ঈমানকে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মসজিদ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মন্তব্য

ক্রেজওয়েল সহ বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) এজন্য মসজিদে নববী তৈরি করেননি যে, তা সামষ্টিকভাবে মুসলমানদের নামাযের কেন্দ্র, কিংবা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কমাণ্ড কেন্দ্র হবে। তিনি মূলত নিজে একটি বাসস্থান এবং পার্শে দেয়ালঘেরা একটি আঙ্গিনা তৈরি করেন। এতে মুসলমানরা নামায পড়তে পারত। মসজিদে নববী সম্পর্কে এটা হচ্ছে প্রাচ্যবিদদের মিথ্যা প্রচারের একটি নমুনা। অথচ কে না জানে যে, মসজিদে নববীর পরিচয় রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসস্থান হিসেবে নয়, মসজিদ হিসেবেই খ্যাত। বরং বাসস্থানের বিষয়টি গৌণ এবং মসজিদের বিষয়টিই মূখ্য।

প্রাচ্যবিদরা আরো বলেছেন, ইসলাম নামাযের জন্য মসজিদ তৈরির কথা বলেনি। বরং মুসলমানরাই রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর নামাযের জন্য মসজিদ তৈরি করেছে। ক্রেজওয়েলের মতে, নবীর ঘরে মানুষ আসত বলে তাদের বসার জন্য একটা ছায়াঘেরা জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে লোকেরা এটাকে মসজিদ বিবেচনা করে যথারীতি তাতে নামায পড়তে থাকে এবং সেটাকে মসজিদের মর্যাদা দেয়। মসজিদে নববী সহ অন্যান্য মসজিদের ব্যাপারে এটা হচ্ছে তার মত। শুধু তাই নয়, ক্রেজওয়েল আরো বলেছে, পরবর্তীতে মুসলমানরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মসজিদ তৈরি করেছে। তার মতে, জামায়াতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যিয়াদ বিন আবীহ ৪৪ হিজরীতে বসরার মসজিদ সম্প্রসারণ করে। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন গোত্রে অবস্থিত মসজিদ থেকে লোকদেরকে একটি জামে মসজিদে জড় করে তাদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা (খোতবাহ) করা।

ক্রেজওয়েল আরো দাবী করেছে, হিজরী ৫৪ সাল পর্যন্ত মদীনাবাসীদের কোন জামে মসজিদ ছিল না। এমনকি নবী (স) মুসলমানদের জন্য কোন মসজিদ তৈরি করেননি।

মসজিদ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের ঐসকল বক্তব্য সম্পূর্ণ কল্পনা বিলাস, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। তারা ঐতিহাসিক সত্যকে দিনে-দুপুরে অস্বীকার করেছে।

কেননা রসূলুল্লাহ (স) হিজরতের পর কুবায় পৌছে সর্বপ্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা কুবা মসজিদ নামে ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে সেই স্মৃতির

কথা আজো স্মরণ করিয়ে দেয়। মক্কী জিন্দেগীতেই নামায ফরয হয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ (স) কুবা থেকে মদীনার অভ্যন্তরে শুক্রবারে রওনা করার পথে বনী সালেম পল্লীতে জুমার নামায ফরয হয়। তিনি সেখানেই জুমার নামায আদায় করেন এবং তখন থেকে এ পর্যন্ত সেখানে একটি মসজিদ বিদ্যমান আছে।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতে জামে মসজিদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "কেবলমাত্র তারাই মসজিদ আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াত লাভ করবে।"

সূরা তাওবার ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ "মোশরেকরা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করতে পারে না।"

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোতে মসজিদের ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই প্রাচ্যবিদরা মসজিদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মূলত ইসলামকেই অস্বীকার করতে চায়। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অধ্যয়ন ও জ্ঞান–গবেষণা এ উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য ঐতিহাসিক তথ্যেরও বিপরীত। মাকরীজী বলেছেন, "হযরত ওমর (রা) যখন বিভিন্ন শহর জয় করেন তখন তিনি বসরার শাসক আবু মূসা আশআরীকে এক চিঠিতে জামায়াত কায়েম করার উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরির নির্দেশ দেন এবং বলেন, জুমার দিন যেন সবাই জামে মসজিদে জুমার নামায জামায়াত সহকারে আদায় করে। তিনি অনুরূপভাবে, কুফার শাসক সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং মিসরের শাসক আমর বিন আসের কাছেও নির্দেশ পাঠান, তিনি সিরিয়ার এলাকার গভর্ণরদের কাছেও অনুরূপ চিঠি পাঠিয়ে মসজিদ তৈরির নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করার অনুরোধ জানান। তাদের প্রতি প্রত্যেক শহরে একটি করে জামে' মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। লোকেরা হযরত ওমর (রা) এর নির্দেশ পালন করেন।"[১]

এ সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করে যে, বসরায় যিয়াদ বিন আবীহর মসজিদ নির্মাণের আগেই হযরত ওমর (রা) বিভিন্ন শহরে মসজিদ নির্মাণের

---

১. আল–খোতাত আল–মাকরীযিয়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

আদেশ দিয়েছেন। ফলে মসজিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য ও মন্তব্য বিলাসী কল্পনার ফানুস ছাড়া আর কি হতে পারে? মুসলমানদের সামাজিক জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মিলনকেন্দ্র মসজিদ সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। মুসলিম সমাজে মসজিদ না থাকলে তা মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর এটাই প্রাচ্যবিদদের তথাকথিত স্বর্গীয় স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের নাপাক দূরভিসন্ধি থেকে রক্ষা করুন।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

রসূলুল্লাহ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যান এবং ৬২২ খৃঃ মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি কুবায় পৌছেন। মদীনায় পৌছে তিনি প্রথমেই কুবায় যে মসজিদ তৈরি করেন, তা ছিল ইসলামের প্রথম মসজিদ। কুবায় দুই সপ্তাহ অবস্থান করার পর তিনি মদীনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌছেন এবং যেখানে তাঁর উট বসে পড়েছিল সেখানেই তিনি মসজিদ তৈরি করেন। এটাকে মসজিদে নববী বলা হয়। এটা ছিল ইসলামের দ্বিতীয় মসজিদ। মসজিদ তৈরির পর মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে তাঁর বাসস্থান তৈরি করেন।

নামায ও ইবাদাতের স্থান নির্ধারণ, সাহাবায়ে কেরামের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর মিলনস্থান, জিহাদে গমনকারী মুজাহিদ মুসলমানদের কমাণ্ডস্থান এবং মুসলমানদের ইলম ও আমল চর্চার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়েছিল।

ইসলামের আগমনের কারণে আরবদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অন্যান্য জাতির মধ্যেও ইসলাম বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

আরব সমাজ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে সেই সকল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বন্ধ করেন। তিনি মদীনাকে রাজধানী করে যে রাষ্ট্র কায়েম করেন তাতে করে আরবরা ইসলাম গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ (স) ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক কাঠামো ঘোষণা করেন।

ইসলাম একটি বিশ্বাস, আদর্শ পদ্ধতি ও সর্বোচ্চ নৈতিক নীতিমালা সহকারে প্রেরিত হয়েছে। তাই মদীনা একদিকে দারুল হিজরাহ এবং অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। মক্কা বিজয়ের পর মদীনা পুরো হেজাজ অঞ্চলের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা) কর্তৃক কুফায় রাজধানী স্থানান্তরের আগ পর্যন্ত দীর্ঘদিনব্যাপী মদীনা ছিল নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী।

মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল এবং অগণিত লোক মুসলমান হওয়া শুরু করল। মূর্তি ও প্রতিমা পূজা ইসলামী

আদর্শের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে লাগল। ইসলাম শিরকের মূলোৎপাটন ঘোষণা করল এবং হালাল ও হারাম, ইসলামী আইন ও বিধান এবং নামাযের জন্য আযান চালু করল। ধনীদের ওপর যাকাত ফরয করে ইসলাম গরীবদের প্রতি সহানুভূতির পদ্ধতি চালু করে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং মোমেনদের নিয়ে সেনা বাহিনী তৈরি করা হল। ইসলাম বিরোধী শক্তি যেন তা দেখে ভয় পায়।

মানুষের মন–মগজের রাজ্যে ইসলামই প্রথম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতির কথা প্রচার করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন নাগরিকদের মধ্যে বর্ণ–বংশ ও ভাষার উর্ধে উঠে তা বাস্তবায়ন করে। ফরাসী বিপ্লবের নেতা রুশোর স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নীতির এক হাজার বছর আগে মদীনায় ইসলামের সেই নীতি বাস্তবায়িত হয়। মহানবী (স) ঘোষণা করেছেনঃ

اَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ اِلاَّ بِالتَّقْوٰى –

"মানুষ চিরুনীর দাঁতের মত সমান। অনারবের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য নেই। শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে।"

তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধসমূহ মেনে চলা। একথা–ই কুরআনেও বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ –

"তোমাদের কাছে সেই ব্যক্তিই বেশী সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী।"

রসূলুল্লাহ (স) আনসার ও মুহাজির এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের সবাইকে নিয়ে ঐতিহাসিক মদীনা সনদ তৈরি করেন এবং এর ভিত্তিতে মদীনার প্রশাসন এবং যুদ্ধ ও সন্ধি নীতি পরিচালনা করেন। এর আগে আরবরা কখনও কোন আদর্শিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। বরং তাদের সামাজিক বন্ধন ছিল গোত্র, বংশ ও আত্মীয়তাভিত্তিক। ইসলামই প্রথম আদর্শিক রাষ্ট্র চালু করে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক ঘোষণা করে। মদীনা সনদের ভিত্তিতে ইহুদী ও খৃষ্টানরা মদীনার ওপর আক্রমণ হলে তার প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক কথায়, মদীনায় ইনসাফ, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণের এক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মসজিদ হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির অন্যতম। তাই রসূলুল্লাহ (স)-এর সময় থেকে মসজিদ নির্মাণের যে ধারা শুরু হয়েছে তা পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈনসহ মুসলিম খলীফা ও শাসকরা অব্যাহত রাখেন এবং সর্বত্র মসজিদ তৈরি করেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রখ্যাত সাহাবী ওকবাহ্ বিন নাফে' আল-ফেহ্‌রী কায়রাওয়ানে ৫০ হিজরী সালে এক মসজিদ তৈরি করেন । মুসলিম শাসকরা পরবর্তীতে আফ্রিকা মহাদেশে বহু ত্যাগের বিনিময়ে মসজিদ নির্মাণের ধারা অব্যাহত রাখায় তা মরক্কো পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তারপর ওকবাহ বিন নাফে' মুআবিয়া বিন হোদাইজ আস্-সূকুনী, আবুল মোহাজের দীনার, যোহাইর বিন কাইস আল-বাল্‌ওয়া, হাস্‌সান বিন নো'মান আল-গাস্‌সানী, মূসা বিন নাসির এবং তারেক বিন জিয়াদের প্রচেষ্টায় স্পেন পর্যন্ত বিজয়ের ধারা ও মসজিদ নির্মাণের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তাঁরা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করেন এবং মসজিদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী সে সকল অঞ্চলে প্রচার করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ (রা) ৩১ হিজরীতে দানকালা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সেখানকার অধিবাসীদের সাথে প্রথম যে চুক্তি করেন তাতে সেখানে নিজ হাতে তৈরি মসজিদ সম্পর্কে উল্লেখ করেনঃ "মুসলমানরা তোমাদের শহরের উপকণ্ঠে যে মসজিদ তৈরি করেছে তার হেফাজত করতে হবে, তাদেরকে মসজিদে এসে নামায পড়তে বাধা দেয়া যাবে না এবং তোমাদের উচিত, মসজিদ পরিষ্কার রাখা, বাতি দেয়া ও এর সম্মান করা।"

মসজিদে নববী

মদীনার বর্ণনা

মদীনা শরীফ মুসলমানদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। এটি হেজাযের একটি মরুদ্যান। যা ফলে-ফুলে শস্য শ্যামল। এটি ৩৯.৩৬ দ্রাঘিমা পূর্বে ও ২৪.২৮ অক্ষাংশ উত্তরে অবস্থিত। শহরের দক্ষিণ-পূর্বদিক উঁচু ভূমি এবং তা সাগরের স্তর থেকে ৬২০-৬৪০ মিটার ওপরে অবস্থান করছে। মদীনা শহরের আয়তন প্রায় ৫০ বর্গ কিলোমিটার।

শহরের চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা। বর্তমানে মদীনা শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। মদীনার জনগণের মধ্যে আজও আনসারদের নম্র ও সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার বিদ্যমান।

মদীনায় শীতকালে প্রচণ্ড শীত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ে। শরত ও বসন্তের আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও মনোরম।

শহরের উত্তর-পশ্চিমে হচ্ছে সা'ল পাহাড়; দক্ষিণে আ'ইর পাহাড় ও আকীক উপত্যকা; উত্তরে ওহুদ ও সাওর পাহাড় এবং কানাহ উপত্যকা; পূর্বে হাররাহ শারকিয়া (নিম্ন পাহাড়ী এলাকা) এবং পশ্চিমে হাররাহ গার্বিয়াহ অবস্থিত।

মদীনার হারাম সীমানা হচ্ছে। দক্ষিণে আ'ইর পাহাড়, উত্তরে সাওর পাহাড়, পশ্চিমে হার্‌রাহ ওয়ারবাহ এবং পূর্বে হার্‌রাহ ওয়াকেম।

মদীনা শরীফের ৯৫ টা নাম আছে। দুনিয়ার আর কোন শহরের এত বেশী নাম নেই। এর মধ্যে তাইয়েবাহ, ইয়াসরেব, আয়্যদুল্লাহ, কারইয়াতু রসূলিল্লাহ, মদীনাতুর রাসূল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। [১]

মদীনার রয়েছে অনেক ফযীলত। রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ্! যে আমার ও আমার এই শহরের অধিবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করে, তাকে তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে দাও।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি মদীনাকে অধিকতর প্রিয়, স্বাস্থ্যকর এবং সেখানকার পরিমাপ যন্ত্রে বরকতের জন্য দোয়া করেছেন।

---

১. বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মদীনা শরীফ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের 'মদীনা শরীফের ইতিকথা' বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

হযরত ওমর (রা) দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত এবং তোমার নবীর শহরে মৃত্যুদান করিও।"

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সাপ যেমন গর্তে ফিরে আসে, তেমনি ঈমানও মদীনায় ফিরে আসবে।" (বুখারী)

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তির পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব সে যেন তাই করে। যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করে আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব।" (তিরমিযী)

ঐতিহাসিক সামহুদী বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স)–এর কবর কা'বা শরীফসহ সব কিছুর চাইতে উত্তম। কা'বা শরীফ মদীনার চাইতে উত্তম এবং মদীনা কা'বা শরীফ ছাড়া মক্কার অন্যান্য অংশ থেকে উত্তম।

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মদীনার বালু কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা।" (বুখারী)

রসূলুল্লাহ (স) বৃদ্ধাঙ্গুলে থুথু দিয়ে তা মাটিতে রাখেন এবং দোয়া পড়ে এক ব্যক্তির জখমের স্থানে তা লাগান। এভাবে জ্বরসহ আরো বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন। তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে মদীনার আওয়ালী এলাকার উৎপাদিত ৯টি আজওয়া খেজুর খাবে ঐদিন তাকে বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।' রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'আজওয়া বেহেশতের ফল।" (আহমদ)

মদীনায় ১৩৩ থেকে ১৩৯ প্রকার খেজুর উৎপন্ন হয়।

মসজিদে নববীর বর্ণনা

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে মহানবী (স) কুবায় প্রায় ২ সপ্তাহ অবস্থান করেন। তারপর মদীনা শহরের অভ্যন্তরে পৌঁছার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে বনী সালেম পল্লীতে শুক্রবারে জুমআর নামায পড়েন এবং জুমআ শেষে তিনি রওনা করেন। তাঁর উট মসজিদে নববীর বর্তমান স্থানে এসে বসে পড়ে। এই স্থানটি ছিল খেজুর শুকানোর স্থান ও উট–বকরীর আস্তাবল। ২ জন ইয়াতীম শিশু ছিল ঐ জায়গার মালিক, রসূলুল্লাহ (স) ১০টি সোনার দীনারের বিনিময়ে ঐ সম্পত্তি কিনেন এবং হযরত আবু বকরকে মূল্য পরিশোধ করার আদেশ দেন। ঐ যমীনে খেজুর গাছ ও মুশরিকদের কবর ছিল এবং এক অংশ ছিল নীচু। তাতে বৃষ্টির পানি জমে থাকত। তিনি খেজুর গাছ কেটে ফেলেন এবং কবরের হাড়–গোড় বের করে অন্যত্র পুঁতে ফেলার

নির্দেশ দেন। নিম্নাংশ ভরাট করেন। ১২ দিন পর্যন্ত তিনি খালি স্থানে নামায পড়েন। তারপর মসজিদ তৈরি করেন। তিনি এবং মোহাজের ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম মিলে মসজিদ তৈরি করেন। আম্মার বিন ইয়াসার (রা)
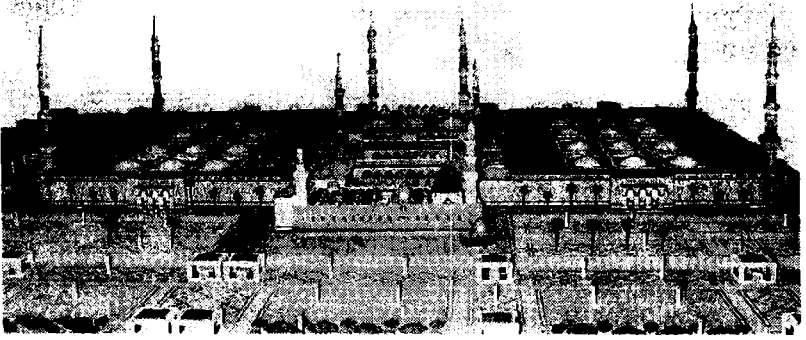
বাদশাহ ফাহাদের সম্প্রসারিত মসজিদে নববীর ছবি

ছিলেন মসজিদের প্রধান রাজমিস্ত্রী ও নির্মাণ কৌশলী। রসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং নিজেও সাহাবায়ে কেরামের সাথে ইট-পাথর বহন করেন। তিনি নিজহাতে একটি পাথর দিয়ে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মসজিদের ভিত্তিতে পাথর, দেয়ালে ইট, চালে খেজুর পাতা ও সুঘ্রাণ এজখের ঘাস এবং খুঁটিতে খেজুর গাছ ব্যবহার করা হয়। চালের ওপর কাদা মাটির প্রলেপ দেয়া হয় ঠাণ্ডার জন্য। একবার বৃষ্টির পানিতে মসজিদের মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর কপাল ও দাড়িতে কাদা লাগে। সাহাবায়ে কেরাম মেঝেতে পাথরের নুড়ি ঢেলে দেন। ১ম হিজরী সনে নির্মিত মসজিদের আয়তন ছিল ৭০ X ৬০ গজ বা ৮৫০·৫ বর্গমিটার। উচ্চতা ছিল ২·৯ মিটার।

৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর ক্রমবর্ধমান মুসল্লীর সংকুলানের জন্য মসজিদকে সম্প্রসারিত করা হয়। এখন এর আয়তন দাঁড়ায় ১০০X১০০ গজ অর্থাৎ ২০২৫ বর্গমিটার এবং ছাদ ৭ গজ উঁচু করা হয়। রসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ের মসজিদের সীমানা এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এ সময় মসজিদের ৩টি দরজা ছিল।

মসজিদে আকসার দিকে মুখ করে তিনি ১৭ মাস নামায পড়েন। তখন তাঁর মেহরাব ছিল মসজিদের উত্তর পার্শ্বে। পরে যখন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ নাযিল হয় তখন তাঁর মেহরাব দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হয়। কা'বার দিকে মুখ করে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি ইমামতি করতেন সে স্থানটি চিহ্নিত আছে। তাতে বর্তমানে আরবীতে লেখা আছে-

هٰذَا مُصَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল দীনের কাজে সার্বক্ষণিক সময়দানকারী সাহাবায়ে কেরামের বাসস্থান। তাঁদেরকে বলা হত আসহাবে সুফ্‌ফা। হযরত আবু হোরায়রাসহ অনেক বড় বড় সাহাবী সেখানে বাস করতেন। তাঁদের নিজেদের কোন আয়-রোজগার ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হত।

মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামায়াত সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নারী-পুরুষ সবাই অংশ গ্রহণ করে।

মসজিদের ভেতর রয়েছে ৮টি ঐতিহাসিক স্তম্ভ। সেগুলোর নাম হচ্ছে, ১. সুবাস স্তম্ভ (ওসতোয়ানা মোখাল্লাকা) ২. আয়েশা স্তম্ভ ৩. তাওবাহ স্তম্ভ ৪. শয়ন স্তম্ভ ৫. পাহারা স্তম্ভ ৬. প্রতিনিধি স্তম্ভ ৭. কবরের বর্গ স্তম্ভ ও ৮. তাহাজ্জুদ স্তম্ভ। প্রত্যেকটা স্তম্ভের রয়েছে বিরাট তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক বর্ণনা। এখানে সে আলোচনার সুযোগ নেই।

মসজিদের ভেতর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে, রাওদাহ বা 'বেহেশতের বাগান' নামক জায়গাটি। রাওদাহর দৈর্ঘ ২২ মিটার ও প্রস্থ ১৫ মিটার। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে বেহেশতের বাগান।" (বুখারী ও মুসলিম) এই জায়গায় ইবাদাত ও এতেকাফের ফযীলত ও সওয়াব অনেক বেশী।

প্রথম প্রথম রসূলুল্লাহ (স) মিম্বার ছাড়াই মসজিদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন। এতে তিনি ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তাই বিশ্রামের উদ্দেশ্যে হেলান দেয়ার জন্য পাশে একটা খেজুর গাছের কাণ্ড দাঁড় করানো হয় এবং সব শেষে তাঁর জন্য একটা মিম্বার তৈরি করা হয়। তিনি ১ম খুতবার পর মাঝখানে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন ও পরে ২য় বার খুতবা দিতে দাঁড়াতেন।

মসজিদে নববীর ফযীলত অনেক বেশী। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোন পবিত্র স্থানে সওয়াবের নিয়তে যেন সফর করা না হয়। সে তিন মসজিদ হচ্ছে, মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং জেরুসালেমের মসজিদে আকসা।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মসজিদে হারাম ছাড়া আমার এই মসজিদে নামায অন্যান্য মসজিদের নামায থেকে এক হাজার গুণ উত্তম।" (বুখারী)

মসজিদে নববীর অন্যান্য ইবাদাতের সওয়াবও নামাযের মতই অতিরিক্ত।

. বিভিন্ন সময় মসজিদে নববীর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়। যারা সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেছেন, তাঁরা হলেন, ১। রসূলুল্লাহ (স) ২। ওমর (রা) ৩। ওসমান (রা) ৪। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক ৫। খলীফা মাহদী ৬। আশরাফ কায়েতবায় ৭। সুলতান আবদুল মজিদ ৮। বাদশাহ আবদুল আযীয ৯। বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আযীয ১০। বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীয এবং ১১। বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয।

বর্তমানে মসজিদের আয়তন হচ্ছে, ৯৮ হাজার ৫ শ বর্গমিটার। মসজিদের ভেতর ১ লাখ ৬৭ হাজার মুসল্লী, ছাদের ওপর ৯০ হাজার মুসল্লী এবং আঙ্গিনায় মোট ২ লাখ ৫০ হাজার মুসল্লী একই সময়ে নামায পড়তে পারে। সব মিলিয়ে একই সময় সাড়ে ৬ লাখ লোক একসাথে নামায পড়তে পারে। মসজিদে কেন্দ্রীয় এয়ার কণ্ডিশনের ব্যবস্থা আছে। ফলে, গরমের সময় মুসল্লীরা ঠাণ্ডা অনুভব করে। এতে ১০ টি মিনারা ও ২৭ টি গম্বুজ আছে। এতে ৭টি প্রবেশ পথ ও ৮২টি দরজা আছে।

মসজিদে পর্যাপ্ত টয়লেট, অযুর জায়গা ও পান করার জন্য ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা আছে। মক্কা থেকে জমজমের পানি নিয়ে মুসল্লীদেরক পান করানো হয়। মসজিদের পার্শ্বে বিরাট গাড়ি পার্কিং এলাকা রয়েছে।

মসজিদের সাথেই রয়েছে রসূলুল্লাহ (স) এর হুজরাহ মোবারক এবং হযরত আলী ও ফাতেমার ঘর। বর্তমানে সে গুলো সম্প্রসারিত মসজিদের ভেতর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

হুজরাহ মোবারকেই তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক শায়িত আছেন। তাঁর কবরটি লোহার জালি দ্বারা আবৃত এবং কবরের চার পার্শ্বে শীশা ঢালাই করে কবর মজবুত করা হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীরা কয়েকবার লাশ মোবারক চুরির উদ্যোগ নেয়ায় ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পার্শ্বেই রয়েছে তাঁর দুই সাথীর কবর। তাঁরা হলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)। ৪র্থ কবরের স্থানটি আজ পর্যন্ত খালি পড়ে আছে।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান মসজিদে নববী যেয়ারতে আসেন এবং সেখানকার ফযীলত কুড়িয়ে নেন। হজ্জ মওসুমে যেয়ারতকারীর সংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।

মসজিদে নববীর ভূমিকা

দুনিয়ার মসজিদসমূহের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা জানার জন্য সবাইকে মসজিদে নববীর ভূমিকা জানতে হবে। কেননা, এটা হচ্ছে ট্রেনের ইঞ্জিনের মত। ট্রেনের বগীগুলোর অন্যদিকে যাওয়ার কায়দা নেই। ইঞ্জিন যেদিকে যায়, তাদেরকেও সেদিকেই যেতে হয়। অন্যান্য মসজিদগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাদেরকে অবশ্যই মদীনার মসজিদে নববীকে অনুসরণ করতে হবে। এটা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিজ হাতে তৈরি ও পরিচালিত। তাই অন্যান্য মসজিদগুলোকে মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। মূল উৎস হচ্ছে মসজিদে নববী। বরং এটাকে অন্যান্য সকল মসজিদের মা বলা যায়। তাই সেগুলোকে তার মাতৃসদনের আসল পরিচর্যা লাভ করতে হবে।

মসজিদে নববীতেই নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনগুলো প্রতিপালিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে গোটা দুনিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। একই উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীর অনুসরণে তৈরি হয়েছে অন্যান্য মসজিদ। ফলে, অন্যান্য সকল মসজিদের শিক্ষা ও পয়গাম মসজিদে নববীর মতই হওয়া জরুরী। সময়ের ব্যবধানে কিংবা ইসলামকে তার যথাযথ মর্যাদা না দিতে পারার কারণে, কোন কোন সময় মসজিদ তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও ভূমিকা পালন করতে পারেনি, সেজন্য সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজ মসজিদের কাম্য অবদান থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

মূলত মুসলিম সমাজ হচ্ছে, মসজিদ ভিত্তিক, তাই মসজিদ থেকেই সমাজের দীনী ও দুনিয়াবী খোরাক সরবরাহ করতে হবে। মসজিদকে সংকীর্ণ ও সীমিত লক্ষ্যে ব্যবহার করা যাবে না। বরং এটা হচ্ছে সকল কল্যাণকর কাজের উৎস। মসজিদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত সমাজ জাহেলিয়াতের অশান্তিতে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।

জ্ঞান সেবা

এখন আমরা মসজিদে নববীর জ্ঞান সেবা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, মসজিদে নববী ছিল ইবাদাতসহ মুসলিম মিল্লাতের একটি বহমুখী প্রতিষ্ঠান বা কর্মশালা। সর্বোপরি তাঁর মসজিদ ছিল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর হাতে সর্বোত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কেরামের মত সুযোগ্য ব্যক্তিত্বসমূহ। তাঁরা তাঁর কাছে আল্লাহর দীন বুঝেছেন। তাঁরা কোন আয়াত শিখার সাথে সাথে তা জানা

ও মানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা–সাধনা করতেন। এরপর অন্যদের কাছে তা পৌঁছাতেন।

স্বভাবতই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সকলের জ্ঞানগত যোগ্যতা সমান ছিল না। তাঁরা নির্বিশেষে ইলেম, হেদায়াত, ফযীলত ও শিষ্টাচার অর্জন করেছেন। তবে সবার সুযোগও সমান ছিল না। অনেকেই ছিলেন অভাবগ্রস্ত। ফলে, জীবিকার দাবী মেটাতে গিয়ে সবাই জ্ঞান আহরণে সমান সময় দিতে সক্ষম ছিলেন না। অথচ, প্রত্যেক সাহাবীই সাধ্যানুযায়ী মসজিদে নববীতে হাযির হওয়ার চেষ্টা করতেন এবং যারপর নেই যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এমনকি হযরত ওমর (রা) তাঁর প্রতিবেশীর সাথে পালাক্রমে মসজিদে নববীতে আসতেন এবং ঐ দিনের আলোচনা পরস্পর পরস্পর থেকে জেনে নিতেন। এভাবে তাঁরা মসজিদে নববীর মহান শিক্ষকের শিক্ষাকে আত্মস্থ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন।

এ বিষয়ে বুখারী শরীফে بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। হযরত ওমর (রা) বলেন,

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ يَوْمًا جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ –

"আমি এবং আমার আনসার প্রতিবেশী রসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে পালাক্রমে যেতাম। তিনি একদিন এবং আমি অপরদিন যেতাম। আমি যেদিন যেতাম সেদিনের খবর প্রতিবেশীকে জানাতাম এবং তিনি যেদিন যেতেন, সেদিনের খবর তিনি আমাকে জানাতেন।" (বুখারী ইলম অধ্যায়)

এ ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ (স)–এর শিক্ষার আসরে অংশ নেয়া। এরকম না হলে, রসূলুল্লাহ (স)–এর বহু শিক্ষা আসর থেকে বঞ্চিত থাকার আশংকা ছিল।

রসূলুল্লাহ (স)–এর ঐ মসজিদটি উত্তম মানুষ ও সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান ছিল। যেখান থেকে কুরআনের স্পর্শে বহু ছাগল ও উটের রাখাল এবং মূর্তি পূজারী হেদায়াতের ইমাম ও পথ প্রদর্শক হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন, আল্লাহর দিকে আহবানকারী, বিচারক ও রক্ষক, রাত্রের নিদ্রাত্যাগী ও দিনের শাহসওয়ার। তাঁরা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ইসলাম ও শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। তাঁরাই মানবতার অজানা মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। তাঁদের এ দীনকে আল্লাহ 'সহজ-সরল দীনে ইবরাহীমী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মসজিদে নববী ছিল যমীনের সাথে আসমানের সংযোগস্থল। এখানেই এমন একটি আসমানী উম্মাহ তৈরি হয়েছে যার কোন নজীর নেই। কেননা, অহীর আলোকে সেটি ছিল মসজিদেরই সৃষ্ট উম্মাহ। অহীর ভিত্তিতে মসজিদে নববী মোমেন ও একদল নেক লোক সৃষ্টি করেছে। ঐ মসজিদ থেকেই হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, যোবায়ের বিন আ'ওয়াম, খালেদ বিন ওয়ালিদ, আবদুর রহমান বিন আওফ, মেকদাদ বিন আসওয়াদ, মেকদাদ বিন আমর এবং আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহ (রা)-এর মত নেক ও প্রতিভাবান লোক তৈরি হয়েছিলেন। তাঁরা এমন ধরনের সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁরা নিজেদের চরিত্র ইনসাফ ও দীনী গুণ-বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তীর ও তলোয়ারের আগেই দুনিয়া জয় করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিশ্বের শিক্ষক ও সম্রাট।

মসজিদে নববী থেকে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ও যুগস্রষ্টা মনীষী তৈরি হয়েছেন। আরো তৈরি হয়েছেন ফকীহ ও মোহাদ্দিস। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবদুল্লাহ বিন ওমর, ইমাম আবু হানীফা, মালেক বিন আনাস, মুহাম্মাদ, শাফেঈ, আহমদ বিন হাম্বল, বুখারী ও মুসলিমের মত প্রথিতযশা প্রদীপ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্য। তাঁদের জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে কত লোক ঝিনুক কুড়িয়েছে এবং তাদের সাহিত্য ও চরিত্র এবং প্রজ্ঞা থেকে কতলোক সিন্ধু সেঁচে মুক্তা পেয়েছে।

এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, কিছু কিছু আলেম বিশেষ বিশেষ মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মদীনার মসজিদে নববীতে ইমাম মালেক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফেঈ (র) মিসরের ফোস্তাত জামে মসজিদে, কুফা ও বাগদাদের মসজিদে ইমাম আবু হানীফা নোমান এবং বাগদাদের মসজিদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এটাতো গেল ফিকাহ শাস্ত্র।

হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণও মসজিদ ভিত্তিক গবেষণা, সংগ্রহ ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। এসহাক বিন রাহ্ওয়াই, ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ মসজিদেই হাদীস শাস্ত্রের সেবা আঞ্জাম দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে, প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক জাহেজসহ আরো অগণিত সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী পণ্ডিতেরা মসজিদেই লেখা-পড়া করেছেন। বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা বের হননি।

রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন, মহান মসজিদে নববীর শিক্ষক ও মানবতার পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাঁকে এ দায়িত্ব সহকারে পাঠিয়ে বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (الجمعة : ٢)

"তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা যিনি নিরক্ষর লোকদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন। রসূল তাদের কাছে আয়াত পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও কৌশল শিক্ষা দান করেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে ছিল।" (সূরা জুমআ ঃ ২)

এ আয়াতে আল্লাহ রসূলুল্লাহ (স)-কে শিক্ষক ও পরিশুদ্ধকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে সাথে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও দান করেছেন। পরিশুদ্ধ করার অর্থ হল, ব্যবহারিক (Practical) প্রশিক্ষণ। কুরআন যে সকল আচরণ ও গুণাবলী অর্জন এবং দোষ-ত্রুটি থেকে দূরে থাকার কথা বলেছে, তিনি সেই আলোকে সাহাবায়ে কেরামকে বাস্তব ট্রেনিং দিয়েছেন, ছাত্ররা সেই বাস্তব ট্রেনিং-এর আলো গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ইসলামী আদর্শ এক অতুলনীয় মানব কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তদানীন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য, ইসলামী শক্তির প্রভাবাধীনে এসে যায়। মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর তাত্ত্বিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করার পর ঐ বিজয় কেন কঠিন হবে?

ইসলামে মসজিদের ভূমিকা হচ্ছে, গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। তাতে দারস ও শিক্ষা এবং ওয়াজ-নসীহত চলে। ছোট বড় ও নারী পুরুষ সবার জন্য ঐ শিক্ষা। প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী সেই সকল শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়।

মসজিদকে মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় এজন্য বলা হয় যে, তাতে ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করা হয় এবং পরে এর দেয়াল ও ছাদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদে দীনী ও দুনিয়াবী সকল ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়। কুরআন, হাদীস, ইসলামী শরীয়াহ বা আইন, ফিকাহ্, ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন, অংক, সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে কোন বাধা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে, জাগতিক বা দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন ফরযে কেফায়াহ। একদল শিক্ষা লাভ করলে অন্যদের ওপর থেকে ফরযে কেফায়াহর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

মসজিদের জ্ঞান সেবার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ –

"কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে ও তার শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং মহান আল্লাহ তাঁর নিকট মওজুদ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।" (মুসলিম)

আমাদের কতই না সৌভাগ্য। ইবাদাতের জন্য মসজিদে ঢুকে আত্মার পবিত্রতা অর্জনের সাথে সাথে দীন ও দুনিয়ার জন্য চলার উপযোগী জ্ঞান নিয়ে আমরা বের হয়ে আসতে পারি।

শিক্ষা ইসলামী দাওয়াতী কাজের উৎস এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাই তাকে জানা ও বুঝা অত্যন্ত জরুরী। ইসলাম একটি কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। সেখানে সুখ-শান্তি অবশ্যই থাকবে। তাই সেখানে ইসলামের দাওয়াতী কাজের জন্য ইসলামের জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত একদল লোককে তৈরি করতে হবে। যাদের নিকট দলীল-প্রমাণ ও বিরোধীদের প্রশ্ন এবং আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার ক্ষমতা থাকবে। সে জন্য ইসলামী শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন। আর রসূলুল্লাহ (স)-কে এ ব্যাপারে নিজ হাতে প্রথমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই তিনি মসজিদে নববীকে মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তাতে শিক্ষা দেন।

ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে ভালভাবে লেখা-পড়ার অধিকারী লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কাল্‌কাসনাদী বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) নবুয়াত লাভের সময় আরবদের মধ্যে লেখকের সংখ্যা তের থেকে ১৯ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।[১]

রসূলুল্লাহ (স)-এর লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান বিস্তার করা। যাতে করে তারা দীনী দাওয়াতের ঝাণ্ডা বহন করতে সক্ষম হয়। রসূলুল্লাহ (স) জ্ঞান শিক্ষাদানে কত বেশী আগ্রহী ছিলেন তা বুঝা যায়

১. সোবহুল আ'সা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৫।

বদরযুদ্ধের বন্দীদেরকে জ্ঞান শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার ঘটনা থেকে। তিনি অর্থদানে অক্ষম শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তির মোকাবিলায় প্রত্যেককে ১০ জন মুসলিম শিশুকে লেখা ও পড়া শিক্ষাদানের শর্ত আরোপ করেন।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য রসূলুল্লাহ (স) যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন কর।' অনুরূপভাবে, যারা মসজিদে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা শিক্ষাদানের জন্য আসেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর রাস্তার মোজাহিদের সমমর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে যারা মসজিদে দর্শক হিসেবে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কোন কিছু শিখে না, তাদের এই আচরণকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ মর্মে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هٰذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذٰلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ اِلٰى مَالَيْسَ لَهُ –

"যে আমাদের এ মসজিদে কিছু ভাল জিনিস শিখতে কিংবা শিখাতে আসে, সে যেন আল্লাহর পথের মোজাহিদ। আর যে এটা ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন এমন জিনিসের দর্শক যা তার জন্য নেই।"

(নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "প্রত্যেক নর–নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" তিনি আরো বলেছেন, "মানুষ দুই প্রকার– জ্ঞানী ও ছাত্র। এই দুই ধরনের লোক ব্যতীত অন্যদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।" [১]

তিনি আরো বলেছেন, "যে জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তার রিযকের জিম্মাদার হন।" [২]

তিনি আরো বলেন, "তোমরা শৈশবের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ কর।" [৩]

তিনি এ পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং অব্যাহত জ্ঞান আহরণের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

---

১. রেসালাতুল মসজিদ ফিল ইসলাম–ডঃ আবদুল আযীয লোমাইলাম–সৌদি আরব।
২. ঐ
৩. ঐ

لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ عَالِمًا مَّا طَلَبَ الْعِلْمَ فَاِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ -

"ব্যক্তি যে সময় পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করে সে সময় পর্যন্ত আলেম বা জ্ঞানী থাকে। যখন সে ধারণা করে যে, শিখে ফেলেছে, তখনই সে অজ্ঞ-মূর্খের কাতারে নাম লেখায়। ১

রসূলুল্লাহ (স) নিজে মসজিদে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ শিক্ষা দিতেন। তিনি মসজিদে নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতেন। একজন গ্রামীন আরব বেদুইন মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়া শুরু করল। কিন্তু ঠিকমত পড়তে পারল না। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নামায এবং নামাযে প্রয়োজনীয় বিনয় ও প্রশান্তির শিক্ষা দান করেন। তিনি বেদুইনকে তিনবার নামায পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তা ভালভাবে শিক্ষা দেন। তিন-তিনবার নামাযের ভুলের জন্য তিনি তাকে তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করেননি। বরং তিনি তাকে এমন উত্তম পদ্ধতিতে নামায শিক্ষা দিয়েছেন, সে বুঝতেই পারেনি রসূলুল্লাহ (স) রাগ করেছেন।

মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে লোকেরা তাঁকে ইসলামের রোকন কিংবা মৌলিক বিষয়গুলোসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি জবাব দিতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন আমরা মসজিদে বসা। তখন এক ব্যক্তি উটের ওপর আরোহণ করে মসজিদে প্রবেশ করে এবং উটটিকে মসজিদে বেঁধে জিজ্ঞেস করে 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে?' রসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে হেলান দেয়াবস্থায় বসা ছিলেন। আমরা জবাব দিলাম, 'হেলান দেয়া সাদা লোকটি।' লোকটি জিজ্ঞেস করেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!' রসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলেন, 'জ্বি-হাঁ।' লোকটি বলেন, "আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো এবং কড়াভাবেই জিজ্ঞেস করবো। আপনি কিছু মনে করবেন না।"

রসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলেন, 'আপনার যা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞেস করুন।' লোকটি বলেন, 'আমি আপনাকে আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী লোকদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। আল্লাহ কি আপনাকে সকল মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ইয়া আল্লাহ! হাঁ।' লোকটি বলেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ সহকারে জিজ্ঞেস করছি,'আল্লাহ কি আপনাকে

১. হায়াতু সাইয়েদিল মোরসালিন-১১৮।

দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন?' রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ইয়া আল্লাহ! হাঁ।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, 'আল্লাহ কি আপনাকে এই মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন?' রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ইয়া আল্লাহ। হাঁ।' লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, 'আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টনের আদেশ দিয়েছেন?' রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ইয়া আল্লাহ! হাঁ।' এবার লোকটি বলেন, "আমি আপনার নবুয়াতের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমার কাওমের লোকদের কাছে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবো। আমার নাম দামাম বিন সা'লাবা এবং আমি বনি সা'দ বিন বকরের ভাই।" (বুখারী–কিতাবুল ইলম)

ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ে আরো উল্লেখ করেছেন, "একদিন রসূলুল্লাহ (স) লোকদের মাঝে বসা ছিলেন। তখন তিন ব্যক্তি আসল। দু'জন রসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে গেলেন এবং অন্যজন চলে গেলেন। দু'জনের মধ্যে একজন মসজিদের মজলিসে একটুখানি জায়গা পেয়ে সেখানে বসেন। অন্যজন বসেন পেছনে। ৩য় ব্যক্তি মসজিদ থেকে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (স) অবসর হওয়ার পর বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এই তিনব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবো না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছেন; আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করেছেন; আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জা বোধ করেন। ৩য় জন ফিরে গেল; আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।" (বুখারী–কিতাবুল ইলম)

একদিন রসূলুল্লাহ (স) নিজ হুজরাহ থেকে বেরিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তাতে দুইদল লোককে বসা দেখতে পান। এক দলে রয়েছেন এমন লোক যারা কুরআন পড়তে পারেন এবং আল্লাহকে ডাকতে পারেন। অপর দলে রয়েছেন এমন লোক যারা লোকদেরকে দীন শিক্ষা দিচ্ছেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই ভাল। (প্রথমোক্ত) দল কুরআন পড়েন ও আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দানও করতে পারেন কিংবা নিষেধও করতে পারেন। আর (২য় দল) তারা নিজেরা শিখে ও লোকদেরকে শিখায় এবং আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" তারপর তিনি তাদের কাছে (২য় দল) যান ও সেখানে বসেন। (ইবনে মাজাহ–১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯)

এ ছাড়াও রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে বসতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে বসে জ্ঞান বা ইলম চর্চা করতেন। বিশেষ করে, তিনি অহী লেখক

সাহাবায়ে কেরামের কাছে যখন যতটুকু অহী নাযিল হত তা তেলাওয়াত করতেন এবং তাঁরা তা লিখতেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী অহী লেখক ছিলেন।

অপরদিকে, সাহাবায়ে কেরাম সকালে নামায পড়ার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মসজিদে নববীতে কুরআন পাঠ করতেন এবং ফরয ও ওয়াজিব শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

রসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনার জিন্দেগীতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঘরে বসে কোন বৈঠক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও শলা-পরামর্শ করার কোন নজীর নেই। বরং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সকল আলোচনা, শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত এবং আদেশ-নিষেধ মসজিদে বসেই দিয়েছেন। সে জন্য পৃথক কোন ঘর বা অফিস তৈরি করেননি। ছোট থেকে বড় সকল বিষয়ে তিনি মসজিদে নববীতে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যুদ্ধ-সন্ধি, অর্থনীতি-রাজনীতি ও সামাজিক পরিকল্পনা মসজিদে বসেই গ্রহণ করেছেন।

রসূলুল্লাহ (স)-এর দুনিয়া ত্যাগের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা) মসজিদে নববীতে লোকদেরকে দীন শিক্ষা দিতেন। সেখানে প্রশ্নোত্তরের আসর বসত এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্নের জবাব দিতেন। হযরত ওমর বিন খাত্তাব, আলী বিন আবী তালেব, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস, আনাস বিন মালেক, যায়েদ বিন সাবেত, মু'আয বিন জাবাল, আবু হোরায়রা, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবু মূসা আশআরী এবং ওবাদাহ বিন সামেত (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা) মসজিদে নববীতে লোকদেরকে শিক্ষা দান করতেন।

হযরত ওবাদাহ বিন সামেত (রা) আহলে সুফফাহকে পড়া ও লেখা শিক্ষা দিতেন।

অনুরূপভাবে সাহাবাদেরকে দর্শনকারী তাবেঈগণও সাহাবাদের অনুসরণে মসজিদে নববীতে বসে লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত করতেন এবং তাদেরকে দীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, ওরওয়াহ বিন যোবায়ের, আবদুল্লাহ বিন ওমরের দাস সালেম, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জোবায়ের এবং মালেক বিন আনাস প্রমুখ। রাবীআ'তুররায় মসজিদে নববীতে মালেক বিন আনাস (মালেকী মাযহাবের ইমাম) এবং হাসান বসরীকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাবীআ'তুররায় ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন, রাবীআ'র মৃত্যুর পর ফেকাহ শাস্ত্রের মজা বিদায় নিয়ে গেছে। ১

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রা) সহ মদীনার অন্যান্য ফকীহগণ মসজিদে নববীতে 'ফতোয়া দিতেন এবং ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও ইজতিহাদে ব্যস্ত থাকতেন। অপর দিকে, ইমাম মালেক (র) মসজিদে নববীতে বসেই হাদীস বর্ণনা করতেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে বসেই প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'আল-মুআত্তা' রচনা করেন।

মসজিদে নববী ছিল ফেক্‌াহ শাস্ত্রের কেন্দ্র ইমাম মালেক (র)-এর মালেকী মাযহাবের উৎপত্তি এ মসজিদ থেকেই। এর পরবর্তী যুগে, ইমাম বাকের ও জা'ফর সাদেক মসজিদে নববীতে লোকদেরকে ফেকাহ ও অসূলে ফেক্‌াহ শিক্ষা দেন।

মসজিদ পাঠাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। দীনী বই-পুস্তকসমূহ মসজিদে রেখে পাঠকদের চাহিদা পূরণ করা হত। সাধারণত ধনী ও জ্ঞানী-গুণী লোকেরা মসজিদে কিতাব-পত্র ও বই-পুস্তক দান করতেন। পরবর্তীতে দেখা গেছে, খাতীব বাগদাদী নিজ কিতাবসমূহ মসজিদে ওয়াকফ করে গেছেন এবং মৃত্যুর আগে তা নিজ বন্ধু আবুল ফদ্বল বিন খাইরুনের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। এ ছাড়া আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ আল-মা'রুফ বিন খাশ্‌শাবসহ আরো অনেকে নিজ কিতাবসমূহ মসজিদে ওয়াকফ করে গেছেন।

এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, মসজিদ সকল জ্ঞান-গবেষণার উপযুক্ত স্থান। রসূলুল্লাহ (স)-এর মসজিদ থেকেই ঈমান, জিহাদ ও জ্ঞানের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হয়েছে। তাই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ওলামায়ে কেরাম মসজিদে বসেই অনুরূপ সেবা আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন।

মসজিদে নববীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকাঃ

মসজিদ হচ্ছে, তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠন কেন্দ্র। এখানে মানুষকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের সকল কাজে উপদেশ দেয়া হয়। সর্বোপরি মসজিদেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও ইসলামী আইন-কানুন মানার সর্বোত্তম পরিবেশ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী।" (আল-কুরআন)

---

১. ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান- ২য় খন্ড, পৃঃ২৯০।

মসজিদে সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন মজবুত হয় এবং দৈনিক পাঁচবারের সাক্ষাতের ফলে তা আরো সুদৃঢ় হয়। সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অনুরূপ সুদৃঢ় সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে।

মসজিদ অত্যন্ত পবিত্র স্থান। মনের পবিত্রতার ওপর স্থানের পবিত্রতার কার্যকর প্রভাব রয়েছে। আর এর মাধ্যমেই সমাজের বৃহত্তম পবিত্রতার রাজপথ খুলে যাবে। তাই পবিত্রতা অর্জন ছাড়া মুসলমানরা মসজিদে যায় না। তাই পবিত্রতা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলবো না যার দ্বারা আল্লাহ গুনাহ মাফ করেন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? আর তা হচ্ছে, ভাল করে সুন্দরভাবে অযূ করা, বেশী পদক্ষেপ সহকারে মসজিদে যাওয়া এবং মসজিদে নামাযের অপেক্ষা করা। এটা তোমাদের জন্য জিহাদের ময়দানে অবস্থান করে পাহারার কাজের সমতুল্য।" তিনি একথা দু'বার বলেন।[১] এর মাধ্যমে আমরা সহজেই মসজিদ ভিত্তিক পবিত্রতার সামাজিক অভিযানের মূল্যায়ন করতে পারি।

মসজিদ মুসলমানের জীবনে বিপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। বিপদগ্রস্ত লোকেরা দলে দলে কিংবা একাকী মসজিদে দৌড়ে আসে ও আশ্রয় নেয়। সেই কঠিন মুহূর্তে মুসলিম দায়িত্বশীলরা সেখানে একত্রিত হয়ে দুর্যোগের মোকাবিলার উপায় বের করেন।

মসজিদ আদালতের ভূমিকা পালন করে। মসজিদের বিছানা ও খুঁটির মাঝ থেকে বিচারকের এমন ইনসাফপূর্ণ রায় ঘোষিত হয়েছে যা গোটা মানবতার বিচারের ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে। মসজিদে বসেই বিচারক উটের রাখালের পক্ষে ও আব্বাসী খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে ইনসাফপূর্ণ রায় ঘোষণা করেছিলেন। বিচারক খলীফার বিরুদ্ধে দরিদ্র-অসহায়-দিনমজুরের পক্ষে রায় ঘোষণা করতে কোন পরোয়া করেননি।[১]

মসজিদে প্রবেশের জন্য বয়সের সুনির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। বরং তাতে বড়-ছোট সবাই প্রবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বংশ, গোত্র ও বর্ণের লোকদের জন্য মসজিদের দরজা সমানভাবে খোলা। সে জন্যই আমরা দেখি কুরাইশ বংশীয় আবু বকর সিদ্দীক, ভিন্ন গোত্রের আবু যার গিফারী, ইথিওপিয়ার নিগ্রো বেলাল, রোমের শেতাঙ্গ সোহাইব ও পারস্যের সালমান (রা) সমানভাবে মসজিদে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। যিনি বেশী তাকওয়ার অধিকারী তাকেই বেশী সম্মান দেখানো হত।

---

১. রেসালাতুল মসজিদ ফিল ইসলাম -ডঃ আবদুল আযীয লোমাইলাম।

১. আল-জামে আল-উমাভী ফি দিমাস্ক- শেখ আলী তানতাওয়ী।

মসজিদে নারীদেরও প্রবেশাধিকার রয়েছে। তা শুধু পুরুষদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। নারীরাও মসজিদের জামায়াতে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং মসজিদের খোতবাহ, বক্তৃতা ও ওয়াজ নসীহত শুনতে পারে। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لاَ تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

"তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে বাধা দিও না।"

শুধু তাই নয়, নারীরা মসজিদের আলোচ্য বিষয়েও অংশগ্রহণ করতে পারে। এর উত্তম প্রমাণ হচ্ছে, একবার হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) বিয়ের দেন–মোহর বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় তা সীমিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আদেশ দেন "তোমরা ৪০ উকিয়ার বেশী স্ত্রীদের দেন–মোহর নির্ধারণ করবে না। কেউ বেশী নির্ধারণ করলে, অতিরিক্ত অংশ বাইতুল মালে জমা করা হবে।" তখন মসজিদে উপস্থিত একজন মহিলা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "হে ওমর! বিষয়টি তোমার এখতিয়ারে নয়। তুমি এ রকম কি করে করবে"? অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا –

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাও এবং তাকে যদি বিপুল পরিমাণ সম্পদ (দেন–মোহর) দিয়ে থাক, তাহলে তা থেকে কোন কিছু রেখে দেবে না। তোমরা কি তা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহর জন্য গ্রহণ করবে?" (আন নিসা ঃ ২০)

যাই হোক, হযরত ওমর (রা) মহিলার কথা ভালভাবে চিন্তা করলেন এবং যখন বুঝতে পারলেন যে, মহিলার বক্তব্য ঠিক, তখন তিনি নিজের মত পরিবর্তন করতে মোটেই ইতস্তত করলেন না। এ প্রসঙ্গেই একটি ঐতিহাসিক প্রবাদ তৈরি হয়েছে। আর তাহল, اَخْطَأَ عُمَرُ وَاَصَابَتْ اِمْرَأَةٌ "ওমর ভুল করেছেন এবং স্ত্রীলোকটি ঠিক বলেছে।" এভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারীদের প্রতি মসজিদের ভূমিকা কিংবা মসজিদে নারীদের ভূমিকা কি ছিল। তারা মসজিদ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে অংশ নিয়েছেন। আরেক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তাদের জন্য ঘরই উত্তম।' মহিলাদের জন্য ঘর উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তারা মসজিদে যেতে চাইলে বাধা দেয়া যাবে না। হযরত

আয়েশার মতে, ফেতনার আশংকা থাকলে নারীরা মসজিদে যেতে পারবে না। তিনি বলেন, মহিলারা পরবর্তীতে যে ফেতনা সৃষ্টি করছে তা যদি রসূলুল্লাহ (স) দেখতেন, তাহলে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন।

রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিভিন্ন দণ্ডবিধি ও শাস্তি কার্যকর করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, যেন ধনী-গরীব, ছোট-বড়, শক্তিশালী ও দুর্বল সবাই ঐ ন্যায়-নীতি দেখে চরিত্র গঠন করতে পারে। মসজিদে অবস্থিত এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে আহবান জানায়, হে আল্লাহর রসূল! আমি যেনা করেছি। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। তারপর সেই ব্যক্তি নিজের অপরাধের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দেয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) তাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি পাগল'? লোকটি বলেন, 'না'। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?' সে জওয়াব দেয়, 'হাঁ'। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর।' [১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স) জুমার নামাযের খুতবাহ দেয়ার সময় এক ব্যক্তি এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর করুন।

অনুরূপ আরেক ঘটনা হচ্ছে, এক ব্যক্তি এক বাগানের মালিককে হত্যা করে। তারপর নিহত ব্যক্তির দুই ছেলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে হযরত ওমরের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু বাদী পক্ষ হত্যাকারীর সত্যবাদিতা দেখে তাকে ক্ষমা করে দেয়।

মসজিদে বর্ণিত দীনী জ্ঞান চর্চাই সব কিছু ছিল না। বরং তা ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও উপযুক্ত ময়দান। তাতে যুদ্ধের বিজয় গাঁথাও গাওয়া হত। হযরত হাস্সান বিন সাবিত মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে নিষেধ করেননি। যে গান বা কবিতায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রশংসা কিংবা ইসলামের প্রতিরক্ষার বিষয়বস্তু থাকবে, তা অবশ্যই উত্তম জিনিস। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বারণ করেননি।

একদিন হযরত হাস্সান (রা) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। হযরত ওমর (রা) মসজিদে তাঁর দিকে নজর দেন। তখন হাস্সান বলেন, 'আমি এই মসজিদে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে কবিতা আবৃত্তি করেছি।

---

১. ফাতহুল বারী- ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১২০-১২২।

তখন ওমর (রা) চলে যান এবং বুঝতে পারেন যে, হাস্‌সান রসূলুল্লাহর (স) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

একদিন কা'ব বিন যোহাইর মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ (স)–সহ সাহাবায়ে কেরামের সামনে ফজর বাদ 'বানাত্ সোআদ' নামক প্রখ্যাত আরবী কবিতাটি পাঠ করেন। অথচ, ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহ (স) তার বিরুদ্ধে মৃত্যু দণ্ডাদেশ ঘোষণা করেছিলেন। তারপর যোহাইর নবীর (স) কাছে ঐ কবিতার দোহাই দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর নবী (স) তার ওপর থেকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেন এবং মৃত্যুদণ্ডের বিনিময়ে ১শ উট দানের নির্দেশ দেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন [১] কা'ব বিন যোহাইর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি তার উল্লেখিত কবিতায় রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রশংসা করেছেন। তারপর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মসজিদে নববীর দরজায় এসে অবতরণ করেন। এবং মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের গোলাকার অধিবেশনে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কা'ব বলেন, আমি মসজিদের দরজায় উট থেকে নেমে পড়ি, রসূলুল্লাহকে তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে চিনতে পেরে তাঁর কাছে গিয়ে বসি এবং ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেই। আমি বলি, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি মুহাম্মাদ (স) হচ্ছেন আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল! আমাকে নিরাপত্তা দিন।" রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে নিরাপত্তা দান করেন।

মসজিদ মুসলমানদের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্রও বটে। এতে মুসলমানরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়। ফলে মসজিদ মিলনকেন্দ্রের কাজ করে। সমাজের অন্যান্য মিলনকেন্দ্রের মতই মসজিদও একই ভূমিকা পালন করে।

মসজিদে ঈদোৎসব সহ বিভিন্ন দীনী ও ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়। ফলে, মসজিদ দীনী উৎসবের পালনকেন্দ্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও মসজিদে বিয়ে অনুষ্ঠান অন্যতম সামাজিক কাজ। তাই যারাকশী রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত এক হাদীসের আলোকে মসজিদে বিয়ে অনুষ্ঠানকে মোস্তাহাব বা উত্তম বলেছেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ –

---

১. আস্‌সীরাতুন নাবুবিয়াত– ৩য় খণ্ড, ৭০৬ পৃঃ।

"তোমরা মসজিদে বিয়ের ঘোষণা দাও এবং মসজিদে বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর।" (তিরমিযী)

এ হাদীসের আলোকে মসজিদে বিয়ে অনুষ্ঠান সুন্নাত। মক্কার মসজিদে হারাম ও মদীনার মসজিদে নববীতে অতীত থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মসজিদের সামাজিক ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইবনে জোবায়ের এবং ইবনে বতুতার মত বিশ্ব পর্যটকের মন্তব্য ও বক্তব্য থেকে। তাঁরা যখনই কোন নতুন দেশে গিয়েছেন, যেখানে কোন পরিচিত লোকজন নেই, সেখানেই তাঁরা প্রথমে মসজিদে হাযির হয়েছেন। মসজিদে স্থানীয় কিংবা প্রবাসী লোকজনের সাথে পরিচিত হওয়ার পর তাদের থাকা-খাওয়ার আর কোন সমস্যা হয়নি। স্থানীয় লোকেরা পর্যটক আলেমের সন্ধান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কোন কোন সময় তাদের যোগ্যতা ও মর্যাদা মোতাবেক উপযুক্ত কাজে যোগদানেরও আহবান জানান। [১]

মূলত মসজিদ হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ এবং মুসলিম লোকজনের সাথে সাক্ষাতের উত্তম কেন্দ্র। আজও মসজিদ যে কোন বিদেশী মুসলমান মেহমানের যোগাযোগ ও আশ্রয়ের উত্তম কেন্দ্র। মেহমান বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও মেজবান তাকে আপন মনে করে এবং ভাষা ও ভৌগলিক এলাকার ব্যবধান ভুলে একাকার হয়ে যায়। কেননা, তারা দীনী ভাই এবং একই উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত। মসজিদের বরকতে, বিদেশী কোন মুসলমান পরদেশেও নিজেকে পর মনে করে না। বরং স্থানীয় মুসলমানগণ বিদেশী কোন মুসলমানকে মসজিদে দেখলে তার প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

মসজিদ দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের দিশারী। যারা মসজিদে সমবেত হয় তাদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার কিংবা শত্রুতা থাকে না। উপস্থিত সবাই নিজেকে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর মেহমান মনে করে এবং স্বয়ং আল্লাহ তাদের তদারক করছেন বলে অনুভব করে। তাই সেখানে সমাজের উন্নয়নে কোন পরিকল্পনা নিলে তা স্বার্থপরতার উর্ধ্বে ও একান্ত কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে বাধ্য। এর বিপরীত কোন ক্লাব কিংবা হলে কাউকে আমন্ত্রণ জানালে এবং সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে নিয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা স্বার্থপরতার দোষে দুষ্ট হতে পারে। মসজিদে কোন আমন্ত্রণকারী কিংবা আমন্ত্রিত কেউ নেই। স্বয়ং আল্লাহই হচ্ছেন সেখানকার আমন্ত্রণকারী এবং বান্দাহরা হচ্ছেন আমন্ত্রিত। তাই তারা আন্তরিকতা ও

---

১. আসসীরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, ৭০৬ পৃঃ।

নিষ্ঠার সাথে যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। তাই ইবাদাতের সাথে সাথে মসজিদ পরোক্ষভাবে, মুসলমানদের হালাল কামাই রোজগারের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে।

মসজিদ হাসপাতাল হিসেবেও সেবা দান করে। ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে মসজিদের একাংশকে যুদ্ধাহত মোজাহেদীনের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হত। এর উত্তম উদাহরণ হল আহযাব যুদ্ধে আওস বংশের নেতা আহত সা'দ বিন মোআ'যকে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবার জন্য রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে একটি তাঁবু কায়েমের নির্দেশ দেন। (বুখারী-১ম খণ্ড) সেখানে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। আনসারী মহিলা সাহাবী রাফিদাহ (রা) ঐ তাঁবুতে যুদ্ধাহত মুসলিম সেনাদের চিকিৎসা— সেবা আঞ্জাম দেন। সম্ভবত আহযাব যুদ্ধের বেশ আগেই তাঁবুটি মসজিদে নির্মিত হয়েছিল।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "মসজিদ হচ্ছে নেতাদের প্রশাসনিক ভবন এবং উম্মাহর সভাকক্ষ। রসূলুল্লাহ (স) তাকওয়ার ওপর নিজ মসজিদের ভিত্তি রচনা করেন। তাতে নামায, কেরাত, যিকর, জ্ঞান শিক্ষা, বক্তৃতার অনুশীলন, রাজনীতি চর্চা, যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন, গভর্ণরদের প্রতি আদেশ, বিত্তলোকদের পরিচিতি অনুষ্ঠান ইত্যাকার কাজসহ মুসলমানগণ নিজেদের দীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে আলোচনা ও সমাধানের জন্য মসজিদে একত্রিত হন।[১]

ওস্তাজ আলী তানতাভী আরব বিশ্বের একজন প্রখ্যাত আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন ঃ[২]

"মসজিদ হচ্ছে, ইবাদাতের স্থান, পার্লামেন্ট, মাদ্রাসা, মজলিস ও আদালত।" তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ইবাদাতখানা অর্থ হচ্ছে, মুসলমানরা হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ফেতনা-ফাসাদ ও মন্দের অনুভূতি ত্যাগ করে ঈমানের উপযোগী খোলা মন নিয়ে বিনয়ের সাথে আকাশের দিকে রহমতের প্রত্যাশী হয়ে এক সারিতে দাঁড়ায়। এতে ছোট, বড়, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু সবাই একাকার হয়ে যায় এবং একজন অন্য জনের পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ ও শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে সমানভাবে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায়। ইবাদাতের ময়দানে সবাই সমানভাবে নন্দিত ও সম্মানিত।

---

১. মাজমু' ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়া-৩৫ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।
২. রেসালাতুল মাসাজিদ ফিল ইসলাম-ডঃ আবদুল আযীয।

পার্লামেন্ট বলতে বুঝায়, মুসলমানদের জীবনে যখনই কোন বড় সংকট কিংবা নেতৃত্বের সমস্যা দেখা দেয় তখনই এই বলে ডাক দেয়া হয়, 'নামায কায়েম হতে যাচ্ছে।' লোকেরা নামাযে সমবেত হওয়ার পর আহূত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা হয়। তাতে খলীফার নির্বাচন, বাইআত গ্রহণ, শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে আইন প্রণয়নসহ এ জাতীয় সমস্যার সমাধান বের করে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়।

মজলিস বলতে বুঝায়, কোন গভর্ণর কোন শহরে আগমন করলে তিনি প্রথমে সেই শহরের জামে' মসজিদে প্রবেশ করেন এবং মসজিদের মিম্বার থেকে সরকারের নীতি ও পদ্ধতি ঘোষণা করেন।

মসজিদে নববীর অর্থনৈতিক ভূমিকা

রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তিনি নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আয় ও ব্যয়কে হালাল করতে হবে এবং হারাম খাদ্য ও রোজগার থেকে দূরে থাকতে হবে।

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ –

"যে গোশত হারাম খাদ্য থেকে জন্মেছে, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে তৈরি গোশতপিণ্ড জাহান্নামেরই যোগ্য।"

(আহমদ, বায়হাকী, দারেমী)

আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছেন। তিনি কুরআনে বলেন, اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন।'

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সূদের সত্তর প্রকার গুনাহ আছে। এর ছোট গুনাহটি হল নিজ মায়ের সাথে যেনা করা এবং বড় গুনাহটি হল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।" (মেশকাত) অথচ মুসলমানদের অর্থনীতিতে সূদের ভিত্তিতে চলছে ব্যাংক–বীমাসহ সকল আর্থিক কাজ কারবার।

আল্লাহ ওজন ও পরিমাপে কম না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ধ্বংস সেই সকল পরিমাপকারীদের জন্য যারা লোকের কাছ থেকে পুরো পরিমাণ গ্রহণ করে কিন্তু তাদেরকে দেয়ার বেলায় কম দেয়।"

–(সূরা মোতাফ্‌ফেফীন ঃ ১)

আল্লাহ আরো বলেছেন, "আর সেই মহান আল্লাহ আকাশকে ওপরে তৈরি করেছেন এবং পরিমাপ যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা ওজনে কম–বেশী না কর। তোমরা ইনসাফের সাথে পরিমাপ কর, আর তোমরা ওজনে কম দিও না।" (সূরা আর রাহমান ঃ ৭–৯)

ইসলামে মওজুদদারী হারাম। এ প্রসঙ্গে মোআ'য বিন জাবাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)–কে বলতে শুনেছি, "সেই ব্যক্তি বড়ই অভিশপ্ত, যে মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখে। তারপর আল্লাহ যদি পণ্য সস্তা করে দেয় তাহলে, সে চিন্তিত হয়। আর যদি মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে সে আনন্দিত হয়।" (মেশকাত)

ইসলামে ঘুষ নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "ঘুষদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামে প্রতিবেশীর অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) থেকে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন ঃ

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ –

"সেই ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খেয়ে তৃপ্ত থাকে আর পার্শ্বে তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।" (মেশকাত)

এছাড়াও মসজিদে নববীতে যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত এবং সাদকাহ ও যাকাতের মাল আসত। রসূলুল্লাহ (স) সেগুলো অভাবী লোকদের মধ্যে বিলি করতেন এবং এতে যাদের অধিকার আছে, তাদেরকে তা দিতেন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক দাতা। প্রতি রমযান মাসে জিবরীলের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি মুক্ত বাতাসের মত উন্মুক্ত দান শুরু করতেন। তিনি নিজের ভাগের অংশ যে কোন অভাবী লোককে চাওয়া মাত্র দিয়ে দিতেন। এ দৃষ্টিতে মসজিদে নববী ছিল অর্থভাণ্ডার ও বিতরণকেন্দ্র। পরবর্তীতেও প্রত্যেকটি মসজিদের ছিল নিজস্ব তহবিল। সেই তহবিল থেকে দান ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা হত।

রসূলুল্লাহ (স) যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি কায়েম করেন। এর ফলে, মসজিদে যাকাতের মাল-সম্পদ জমা হত। মসজিদ থেকেই যাকাতের অর্থ গরীব লোকদের মাঝে বন্টন করা হত। এ যাকাত পদ্ধতির কারণেই মুসলিম সমাজের অভাবী ও সর্বহারা লোকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় এবং খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীযের আমলে যাকাতের সংগৃহীত অর্থ বন্টনের জন্য কোন গরীব মুসলমান-অমুসলমান কাউকেই পাওয়া যায়নি। আল্লাহ ইসলামী অর্তনীতির বরকতে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করে দিয়েছেন।

আজও মসজিদের এ ধরনের তহবিল থাকলে অভাব ও দারিদ্র দূর করে বহু সামাজিক সেবা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব।

মসজিদে নববীর রাজনৈতিক ভূমিকা

রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীকে 'দারে নাদওয়া' বা শলা-পরামর্শের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি মুসলমানদের সাথে মসজিদে দীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে এবং বিশেষ করে যুদ্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

আমরা দেখতে পাই, তিনি মসজিদে নববী থেকেই বদর যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি মসজিদে আনসার ও মোহাজেরদেরকে ডাকেন এবং মক্কার আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কাগামী বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের প্রস্তাব দেন। কেননা, মক্কার কোরাইশরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে তার কোন নজীর নেই। তারা মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বাধ্য করে এবং তাদের সকল ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা ভোগ করে। বাণিজ্য কাফেলার ওপর প্রস্তাবিত আক্রমণ দ্বারা উপরোল্লিখিত বিষয়ের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হতে পারে।

কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) যখন খবর পেলেন যে, কোরাইশরা মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তখন তিনি মোহাজির ও আনসারদেরকে পুনরায় মসজিদে একত্রিত করে তাদের সাথে শলা-পরামর্শ শুরু করেন। মোহাজিরগণ রসূলুল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের শপথ ব্যক্ত করেন এবং সর্বাবস্থায় ও যে কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

তারপর আনসারদের মুখপাত্র সা'দ বিন মোআ'য (রা) আনসারদের মতের প্রতিধ্বনি করে বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যবাদী মনে করেছি এবং সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি যে

অহী নিয়ে এসেছেন, তা হক ও সত্য। এ বিষয়ে আমরা আপনাকে 'শুনা' ও 'আনুগত্যে'র প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেন কিংবা আপনি যা ইচ্ছা করেন তা বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা আপনাকে ঐরকম বলবো না, যেরকম ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)–কে বলেছিল যে, "তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এখানে বসা আছি।" কিন্তু আমরা বলবো, "আপনি ও আপনার রব যান এবং যুদ্ধ করেন, আমরা অবশ্যই আপনাদের উভয়ের সাথে আছি। আমরা আপনার সাথে থাকবো। সেই আল্লাহর শপথ। যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে এই সাগরে পাড়ি জমান, আমরা অবশ্যই আপনার সাথে থাকবো, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিও পিছপা হবে না। আমরা আগামীকাল পর্যন্ত শত্রুর মোকাবিলা অপসন্দ করি। আমরা যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করবো এবং সত্যবাদিতার পরিচয় দেব। আল্লাহ হয়তো আমাদের মধ্যে আপনাকে এমন জিনিস দেখাবেন যার দ্বারা আপনার চোখ শীতল হবে। আমাদেরকে নিয়ে আল্লাহর বরকতের উদ্দেশ্যে রওনা করুন।"

বদর যুদ্ধে ৩১৩ জনের মুসলিম বাহিনী ১ হাজার কোরাইশ বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে এবং কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাহায্য করে নিজ ওয়াদা পূরণ করেছেন। মসজিদ থেকেই যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। তাই এ বিজয়ও বরকত।

বদর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মক্কার কোরাইশরা এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে পরের বছর ওহোদ যুদ্ধের জন্য মদীনা আগমন করে। রসূলুল্লাহ (স) কোরাইশ বাহিনীর মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকে যে বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হয়, সেটি হল, মুসলমানরা মদীনা শহরের ভেতর থেকে প্রতিরক্ষার কাজ করবে, না শহরের বাইরে যাবে।

দীর্ঘ শলা–পরামর্শ ও আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, মুসলিম বাহিনী শহরের বাইরে যাবেন। বিশেষ করে তারা ওহোদ প্রান্তরে যাবেন। বদর যুদ্ধে যে সকল যুবক অংশগ্রহণ করে সম্মানিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি, তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রসূলুল্লাহ (স) শহরের বাইরে ওহোদ প্রান্তরে যেতে রাজী হলেন। যদিও তিনি প্রথম দিকে শহরের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলও বাইরে যেতে প্রস্তুত ছিল না।

এ প্রসঙ্গে ইবনে হেশাম তার সীরাত গ্রন্থে লিখেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! আমি ভাল স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি গরু জবেহ করা হয়েছে, আমি আমার তলোয়ারকে ভোঁতা দেখেছি এবং আরো দেখেছি যে, আমি আমার হাত সুরক্ষিত লৌহবর্মের ভেতর ঢুকিয়েছি। আমি একে মদীনা শহর বলে ব্যাখ্যা করেছি। তোমরা যদি চাও মদীনা শহরে অবস্থান কর এবং তাদেরকে তাদের অবতরণ স্থলে থাকতে দাও। তারা যদি অবস্থান করে তাহলে, নিকৃষ্ট স্থানেই অবস্থান করবে এবং যদি তারা আমাদের শহরে প্রবেশ করে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।"

এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ (স) মদীনার বাইরে যাওয়াটাকে পসন্দ করেননি। তারপরও মুসলমানদের পরামর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ওহোদ প্রান্তরে বেরিয়ে যান। সেখানে কাফের বাহিনীর সাথে মুসলমানদের বিরাট যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে আছে।

রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাতেন। প্রতিনিধিরা মসজিদের পার্শ্বে সওয়ারী বেঁধে মসজিদের খোলা অংশে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন। সম্ভবত মদীনায় পৌছে সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরির এটাই প্রধান কারণ। ঐ মসজিদের উদ্দেশ্য শুধু ইবাদাত ও নামায পড়াই নয় বরং তার উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক এবং তাতে রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ইসলামের প্রথম যুগে মসজিদকে বর্তমান যুগের পার্লামেন্টের সাথে তুলনা করা যায়। এর উত্তম উদাহরণ হল, মক্কা বিজয়ের পর কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ (স) মক্কাবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি ইসলামের কিছু মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং বিজিত মক্কাবাসীর কাছে তাদের বিষয়ে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তারা ক্ষমা-সুন্দর ভূমিকার আহবান জানায়। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর মক্কাবাসীরা ঐ খবর শুনে এবং তাদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক লোক ইসলাম ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন সোহাইল বিন আমর কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করে বলেন, "এই মৃত্যু ইসলামকে শক্তিশালী ছাড়া আর কিছুই করবে না। কেউ যদি

ইসলাম ত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে যায়, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। তারপর বলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা এমন হয়ো না যে, সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করে সর্বাগ্রে তা ত্যাগ করবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এ দীনকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পর্যায়ে নিয়ে পৌছাবেন। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি এবং তোমরাও এখন আমার সাথে তা উচ্চারণ করে বল, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই,' আরবরা তোমাদের অনুগত হবে, অনারবরা তোমাদেরকে জিযৃইয়া কর দেবে। আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই পারস্যের কেসরা ও রোম সম্রাট কাইসারের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে। এ কথার প্রতি ঠাট্টাকারী ও তালিদানকারী উভয়ই থাকবে। ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর যে অংশ এখন বাস্তবায়িত হয়েছে তাতো তোমরা দেখলে। আল্লাহর কসম, বাকী অংশও সত্যে পরিণত হবে। "এরপর লোকেরা মোরতাদ হওয়ার মনোভাব ত্যাগ করল। [১]

রসূলুল্লাহ (স)-এর পরে আমরা খোলাফায়ে রাশেদাকেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখি। তারাও উম্মাহর কাছে মসজিদে নিজেদের শাসন পদ্ধতি এবং লোকদের সাথে ভবিষ্যত আচরণের ধরনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এমন কি খলীফাদের প্রতি বাইআত বা আনুগত্যের শপথও তারা মসজিদে নিতেন। এ সব কিছু মসজিদ ও মিম্বার থেকেই হত। এটা ছিল পুরো রাজনৈতিক বিষয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর মসজিদে নববীতে বাইআতের জন্য যান এবং তিনি যে নীতি অনুসরণ করবেন সে সম্পর্কে ভাষণ দেন। বাইআত শেষে তিনি মিম্বারে ওঠেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করেন। তারপর বলেন, "হে লোকেরা! আমি তোমাদের খলীফা নির্বাচিত হয়েছি অথচ আমি তোমাদের উত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভাল কাজ করি আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি খারাপ কাজ করি তাহলে আমাকে সোজা করে দেবে। সত্যবাদিতা আমানত এবং মিথ্যা হচ্ছে খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিও আমার কাছে সবল যে পর্যন্ত না আমি তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেই। তোমাদের সবল ব্যক্তিও আমার কাছে দুর্বল যে পর্যন্ত না আমি তার কাছ থেকে অন্যের অধিকার কেড়ে আনি। তোমাদের কেউ আল্লাহর পথে জিহাদ ত্যাগ করতে পারবে না। কোন জাতি জিহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ নাযিল করেন। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য কর যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি। আমি যদি আল্লাহ ও

---

১. এতহাফুল ওয়ারা বি আখবারে উম্মিল কোরা – ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৪।

তাঁর রসূলের নাফরমানী করি, তাহলে তোমাদের ওপর আমার কোন আনুগত্য নেই। তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও।"[১]

হযরত আবু বকর (রা) নিজ বক্তৃতায় ইসলামের সুমহান নীতিমালা তুলে ধরেন। আজও তাঁর সেই ভাষণ ইতিহাসের কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। ১৪'শ বছর যাবত মানুষ সেই ভাষণ পড়ে আশ্চর্য হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত ভাষণটিতে তিনি রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এটি ইতিহাসের সর্বোত্তম রাজনৈতিক সরকারী কর্মসূচী হিসেবে বিবেচিত। তিনি নিজ ভাষণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা তুলে ধরেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. তিনি সাধারণ মানুষের কাতারের লোক। তাই তিনি মানুষের কাছে উপদেশ চেয়েছেন ও সমালোচনা কামনা করেছেন।

২. তিনি মিথ্যা ত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন। এটা একটা নৈতিক গুণ।

৩. তিনি সরকারী নীতিতে সাম্যকে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে বলেছেন, তাঁর কাছে সবল-দুর্বল সবাই সমান। কেউ বিশেষ কোন প্রাধান্য পাবে না।

৪. তিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের আহবান জানিয়েছেন।

৫. ইসলামী শরীয়াতের ভেতর থাকা অবস্থায় তিনি লোকদেরকে আনুগত্য করার আহবান জানিয়েছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর উসামা বিন যায়েদের বাহিনীর যাত্রা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ২য় দফা মসজিদে নববীতে ভাষণ দেন। তখন একদল লোক মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। ইহুদী-নাসারারা শত্রুতা শুরু করেছে এবং মুসলমানরা গভীর বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামের একটা অংশ উসামা বাহিনী না পাঠানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) উসামা বাহিনী পাঠানোর বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন, তিনি মদীনার তিনমাইল দূরে জোরফে অবস্থানকারী উসামা বাহিনীকে রওনা দেয়ার নির্দেশ দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু ধর্মত্যাগী ও মুসলমানের শত্রু ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর কিছু আরব গোত্র মোরতাদ হয়ে যায়। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে হযরত আবু বকর (রা) মসজিদে নববীতে ৩য় বার ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে

১. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক তাবারী, ৩য় খণ্ড- পৃঃ ২১০।

বলেন, "তারা রসূলুল্লাহর কাছে প্রদত্ত যাকাতের উটের একটি রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।"

এ প্রসঙ্গে মুসলমানরা পরস্পর আলোচনা করতে থাকেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, "আল্লাহ্ হযরত আবু বকরের রায়ের ব্যাপারে আমার অন্তর প্রশস্ত করে দিয়েছেন।" অর্থাৎ তিনি হযরত আবু বকরের সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা পরে বুঝতে পেরেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) মন্তব্য করেছেন, "আমরা রসূলুল্লাহ (স)–এর ইন্তেকালের পর এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলাম যে, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাই, যদি না আল্লাহ্ আবু বকরকে আমাদের কাছে দান করতেন।"

হযরত ওমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর মসজিদে নববীতে এক ভাষণ দেন। তিনি ভাষণের প্রথমে বলেন, "আরবদের উদাহরণ হচ্ছে সেই উটের মত যা বেত্রাঘাতের পর তার চালককে বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করে। তাদের দেখা উচিত, পরিচালক কোন্ দিকে পরিচালনা করে। কা'বার রবের শপথ, আমি তাদেরকে (সঠিক) রাস্তায় তুলবো।" [১]

ইবনু আবৃদি রাব্বিহি বলেছেন, হযরত ওমর (রা) খেলাফত লাভ করার পর মসজিদে নববীর মিম্বারে ওঠেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে বলেন, "হে লোকেরা! আমি আল্লাহর কাছে দোয়া জানাচ্ছি, তোমরা আমীন বল। হে আল্লাহ! আমি কঠোর, আমাকে তোমার আনুগত্যকারীদের প্রতি বিনম্র করে দাও, আমি যেন সত্যের অনুসরণ, তোমার সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির ভিত্তিতে তাদের সাথে নরম ব্যবহার করতে পারি, আমাকে তোমার দুশমন ও মোনাফেকের প্রতি কঠোর হওয়ার তওফীক দান কর, আমি যেন তাদের ওপর কোন যুলুম ও অন্যায় না করি। হে আল্লাহ! আমি কৃপণ, আমাকে অপচয়, সুনাম ও লোক দেখানোর অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে নেক কাজের দাতা বানিয়ে দাও। আমি যেন এর মাধ্যমে তোমার সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি লাভ করতে পারি। হে আল্লাহ! আমি যেন মু'মিনদের জন্য বাহু নীচু করতে পারি এবং তাদের প্রতি নরম হতে পারি। হে আল্লাহ! আমি বেশী উদাসীন ও বেশী ভুল করি, আমাকে প্রতি মুহূর্তে তোমার যিকর করার তওফীক দাও এবং সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করার যোগ্যতা দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগত আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল, আমাকে সেক্ষেত্রে কর্মতৎপর করে দাও এবং নেক নিয়ত সহকারে শক্তি দাও। তোমার সাহায্য ও তওফীক ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! আমাকে দৃঢ় বিশ্বাস বা

---

১. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক –তাবারী ৩য় খণ্ড।

ইয়াকীন, নেক কাজ ও তাকওয়ার তওফীক দান কর এবং তোমার সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা ও লজ্জা পাওয়ার ব্যথা স্মরণ করিয়ে দিও। তুমি যে কাজে সন্তুষ্ট থাক সে কাজে আমাকে বিনয় দান কর, নিজের আত্ম-সমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগ দাও এবং সন্দেহ থেকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ! আমার জিহ্বা থেকে তোমার কিতাবের যে সকল কথা উচ্চারিত হয় সেগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং অন্তর্নিহিত ভাব বুঝাসহ সেগুলোর প্রতি আমল ও চিন্তা-গবেষণা করার তওফীক দাও। তুমি সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান।[১]

মুসলিম মিল্লাতের ২য় খলীফা হযরত ওমর (রা) দোয়ার মাধ্যমেও নিজের সম্ভাব্য নীতির আভাষ দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর কাছে তওফীক কামনা করেছেন, যেন ন্যায়ের প্রতি আপোষকামী ও বাতিলের প্রতি আপোষহীন হতে পারেন এবং তাতে যেন অন্যায়কারীদের ওপর কোন যুলুম না হয়। এ ছাড়াও তিনি তাকওয়া, মৃত্যু ও পরকালের ভয় এবং সকল কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তওফীক কামনা করেছেন।

হযরত ওমর (রা) আরেক দিন মসজিদে নববীতে এক ভাষণে বলেন :

"হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে মারার জন্য কিংবা তোমাদের সম্পদ নেয়ার জন্য কোন কর্মচারী পাঠাই না। আমি তাদেরকে পাঠাই তোমাদের দীন ও নবীর সুন্নাত শিক্ষা দেয়ার জন্য। কোন কর্মকর্তা যদি এর বাইরে কোন কাজ করে সে ব্যাপারে আমার কাছে যেন অভিযোগ করা হয়, আল্লাহর কসম, আমি এর প্রতিশোধ নেবো। তখন আমর বিন আস লাফ দিয়ে হাযির হন এবং জিজ্ঞেস করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কোন কর্মচারী যদি প্রজা সাধারণকে আদব শিক্ষার উদ্দেশ্যে মারে তাহলেও কি আপনি এর প্রতিশোধ নেবেন? ওমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি বদলা নেবো। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কেও অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি। সাবধান! তোমরা মুসলমানদেরকে মেরে লাঞ্ছিত করো না এবং তাদেরকে ধ্বংস করো না।" ২

পারস্য বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় তিনি মুসলমানদেরকে মসজিদে নামাযের জন্য আহবান করেন। ইতিমধ্যে তিনি বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে এ বিষয়ে শলা-পরামর্শ শেষ করেন। তারপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে তিনি বলেন :

---

১. আল-একদুল ফরীদ – ৪র্থ খণ্ড।
২. আল-কামেল ফিত্তারীখ-৩য় খণ্ড।

"আল্লাহ মুসলমানদেরকে দীন ইসলামের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তিনি তাদের অন্তরকে জোড়া দিয়েছেন, তাদেরকে ভাই হিসেবে আপন করে দিয়েছেন। মুসলমানরা একই দেহের মত। তাদের একজনের শরীর ব্যথা হলে অন্যরাও সে ব্যথা অনুভব করবে। মুসলমানদের সকল বিষয় পরামর্শের ভিত্তিতে সংঘটিত হবে। মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ দিতে হবে। অন্যদের সে ঐক্যবদ্ধ পরামর্শ অনুসরণ করা জরুরী।" ১

হযরত ওমর (রা) আরো পরামর্শ করলেন, পারস্য বাহিনীর অধিনায়ক কাকে বানানো যায়। প্রশ্ন ছিল, তিনি নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন না অন্য কেউ। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা খলীফাকে সেনাবাহিনীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে মদীনায় অবস্থানের পরামর্শ দেন এবং হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে অধিনায়ক বানিয়ে পাঠানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এভাবে তদানীন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তির অন্যতম পারাশক্তি পারস্যের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত মসজিদে নববীতেই গৃহীত হয় এবং সে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয় ও পারস্য মুসলমানদের শাসনে আসে।

হযরত ওসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর পরামর্শ সভার বাইআত শেষে মসজিদে নববীতে যান এবং মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি সবাইকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের ধোঁকায় পড়তে বারণ করেন এবং পরকালের বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করে বলেন :

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

"তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ শুনাও, যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করেছি। এর মাধ্যমে যমীনের উদ্ভিদ জন্মেছে। তারপর তা শুকিয়ে যায় ও বাতাসের সাথে উড়ে যায়। আল্লাহ সকল জিনিসের ওপর শক্তিবান ও ক্ষমতাশীল। সম্পদ ও সন্তান হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য এবং তোমার রবের কাছে রেখে যাওয়া নেক কাজের সওয়াব উত্তম ও অধিকতর আশাপ্রদ।' (সূরা কাহাফ : ৪৫-৪৬)

---

১. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক –তাবারী ৩য় খণ্ড।

তাঁর এ ভাষণে যদিও রাজনৈতিক বক্তব্য কিংবা সম্ভাব্য প্রশাসনিক ভূমিকার উল্লেখ নেই, তথাপি তাতে এ সকল কিছু নিয়ন্ত্রণকারী প্রয়োজনীয় আকীদা ও উপদেশের উল্লেখ রয়েছে। একজন মুসলিম খলীফা তাঁর প্রথম ভাষণে বিস্তারিত শাসন প্রণালী সম্পর্কে আলোকপাত না করলেও তিনি যে, ইসলামের নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থাই অনুসরণ করবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তাছাড়া, পরবর্তীতে তিনি নিজ ভাষণ ও তৎপরতায় ইসলামী জীবনদর্শনের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই করেননি।

হযরত ওসমানের শাহাদাতের পর মদীনার আনসার ও মোহাজিরগণ মসজিদে নববীতে একত্রিত হন এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা করেন। সবাই হযরত আলী (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করেন। কেউ কেউ বলেছেন, কিছু লোক হযরত আলীর ঘরে যান, তাঁকে বাহির করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা বাইআত নেই। হযরত আলী (রা) তা অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত লোকদের পীড়াপিড়িতে এ শর্তে রাজী হন যে, মসজিদে নববীতে তাঁর প্রকাশ্য বাইআত হতে হবে এবং একজন লোকও তাঁর খেলাফতের বিরোধী থাকলে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। তখন সবাই মসজিদে যান ও বাইআত গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম যোবাইর বিন আওয়াম ও তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ বাইআত নেন। তারপর অন্যান্য লোকেরা বাইয়াত নেন। বাইআত শেষে তিনি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে কিছু জরুরী উপদেশ দেন। উপদেশগুলো নৈতিক ও দীনী বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। সেগুলোতে রাজনৈতিক ও সম্ভাব্য প্রশাসনিক নীতিমালার উল্লেখ ছিল না। তিনি সবাইকে ভাল কাজ করা, খারাপ কাজ পরিহার করা, ফরয আদায় করা, হারাম থেকে দূরে থাকা, এখলাস ও একতা বজায় রাখা, মৃত্যুকে স্মরণ রাখা, মানুষের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং কল্যাণের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার উপদেশ দেন।

একবার মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা) মদীনায় আসেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে মিম্বারে উঠে একটি ভাষণ দেন। পরবর্তী আরেক সময়ে তিনি মদীনায় আসেন এবং পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করে ভাষণ দেন। উভয় ভাষণে তিনি তাঁর সরকারের ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি মদীনাবাসীকে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের আহবান জানান।

এ সকল তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের ভূমিকা শুধু দীনী ভূমিকা নয় বরং মসজিদ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকাও

পালন করেছে। মসজিদে নববীর ভূমিকা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র অন্যান্য মসজিদে সম্প্রসারিত হয়েছে।

মসজিদে জনতার ক্ষোভ এবং বিপ্লবও সংঘটিত হয়। যেমন, হযরত ওসমান (রা–এর বিরুদ্ধে কয়েকটি দেশের মসজিদে সেই ক্ষোভ দেখা গেছে। খোলাফায়ে রাশেদার দু'জন খলীফা মসজিদেই শহীদ হয়েছেন। একজন হলেন, হযরত ওসমান (রা) এবং অন্যজন হলেন, হযরত আলী (রা)। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত আলী মসজিদে শহীদ হননি। বরং তিনি ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাস্তায় শহীদ হন।

অপরদিকে হত্যার প্রচেষ্টা থেকে দামেস্কের মসজিদে হযরত মুআবিয়া এবং মিসরের মসজিদে হযরত আমর বিন আস রক্ষা পান। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকদের ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে ঐ তিনজন মুসলিম নেতাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

আবদুর রহমান বিন মুলজেম হযরত আলীকে হত্যা করে। বারক বিন আবদুল্লাহ তামীমির হাত থেকে হযরত মুআবিয়াহ (রা) রক্ষা পান এবং আমর বিন বকরের হাত থেকে হযরত আমর বিন আস (রা) রক্ষা পান।

মসজিদে নববীর ভূমিকা সর্বত্র পুনর্জীবিত হউক, এই হচ্ছে আজকের কামনা–বাসনা।

মসজিদে নববীর সামরিক ভূমিকা

রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন, ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, নেতা, শিক্ষক–প্রশিক্ষক এবং অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহকারী। তিনি নিজ চরিত্রের আলো দ্বারা সেনাবাহিনীর চরিত্রকে আলোকিত করেছেন। আর এটা করেছিলেন ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। ঐ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, নামায়। নামাযে যে সাম্য, শৃংখলা, ঐক্য ও আনুগত্যের বাস্তব ট্রেনিং রয়েছে, তা কি দুনিয়ার আর কোন জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে? এখানে ধনী–গরীব, বড়–ছোট, স্বাধীন–পরাধীন এবং আশরাফ ও আতরাফ সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই নেতার অধীন যে বাস্তব ট্রেনিং গ্রহণ করে তা অপূর্ব। তাই ইসলাম জামায়াতে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর নামায ও জামায়াত মসজিদেই অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে নামায পড়ার মাধ্যমে ইসলাম মুসলমানের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, সবাইকে জামায়াতী জিন্দেগী বা সামষ্টিক জীবন যাপন করতে হবে এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। এ জামায়াতের

শরীক অন্যান্য সদস্যদের সুখ–দুঃখে অংশগ্রহণ করানোও এর অন্যতম লক্ষ্য। মূলত মানবীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাই।

তাই অমুসলিম প্রাচ্যবিদরাও মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, নামাযে রয়েছে মূল্যবোধের শিক্ষা । মূলত তা ছিল সামরিক ট্রেনিং এবং মসজিদ ছিল সামরিক মহড়া ও কুচকাওয়াজের স্থান। নামাযের মাধ্যমে সেই কুচকাওয়াজ সম্পন্ন হত। সামরিক বাহিনীতে বর্তমান যুগে উঠা, বসা ও শোয়ার যে ট্রেনিং দেয়া হয়, নামাযের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই।

নামায ইসলামের ২য় খুঁটি বা রোকন। ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে নামায হচ্ছে, পার্থক্য সৃষ্টিকারী। তাই রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْعَهْدُ الَّذِیْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ–

"আমাদের ও তাদের (অমুসলমানদের) মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাযের, যে নামায ত্যাগ করে, সে কুফরী করে।"

মসজিদ ভিত্তিক নামায ইসলামী শিক্ষা ও চরিত্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মূলত 'মসজিদ একটি প্রশিক্ষণ শিবির। কিসের প্রশিক্ষণ শিবির? নিয়ম–নীতি ও শৃংখলার প্রশিক্ষণ শিবির। সময়ের নিয়মানুবর্তিতা ও এর মূল্য বুঝা এবং ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করার জন্য আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। নির্ধারিত নামাযসমূহের জন্য মসজিদে জামায়াতের সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সে সময় অনুযায়ী দিনে পাঁচ বার মসজিদে হাযির হতে হয়।

এরপর রয়েছে, সোজা ও সমানভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো। কাতার সোজা না হলে গুনাহ হয় এবং নামায অসম্পূর্ণ থাকে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

صَفُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

"তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াও। কাতারের মাধ্যমে নামায পরিপূর্ণ হয়।"

এটা মু'মিনের ব্যবহারিক জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা।

মুসল্লীকে প্রতি মুহূর্তে ইমামের প্রতিটি নড়াচড়া ও বিশ্রামের অনুসরণ করতে হয়। যেমন, ইমাম রুকূ'তে গেলে মুসল্লীকেও রুকূতে যেতে হয় এবং ইমাম বসলে মুসল্লীকেও বসতে হয়। এভাবে ইমামের অনুসরণ করে নিজের জীবনে যুক্তিসঙ্গত কাজ ও শৃংখলার শিক্ষা নিতে হয়।

এ ছাড়াও তাতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে ইমামত বা নেতৃত্ব দানের শিক্ষা রয়েছে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী, ইমামতি করার যোগ্যতা ও অধিকার তার। যেন অপাত্রে কোন কিছু না রাখা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নেতৃত্ব বা পরিচালনার দায়িত্ব অপাত্রে দান করলে কেয়ামতের অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ তা কেয়ামতের লক্ষণ।

নব্য উপনিবেশবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদীরা কোন দেশ জয় করে বিজয়ের প্রতীক হিসেবে নিজেদের পতাকা উত্তোলন করে। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা বিজয়ের পর মসজিদ তৈরি করে প্রমাণ করে যে, এটি ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হয়ে গেছে। মসজিদ তৈরির অন্য উদ্দেশ্য হল, সংশ্লিষ্ট যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা, বিজিতের ওপর বিজয়ীর সার্বভৌমত্ব নয়। কুবা ও মদীনায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম ঐ মসজিদ দু'টো তৈরি করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই ঘোষণা করেছিলেন। আমরা আরো দেখতে পাই কূফা, ফোস্তাত ও কায়রাওয়ানে বিজয়ী মুসলমানরা নিজেদের গর্ব-অহংকারের কথা বাদ দিয়ে জুমআর খোতবায় শুধুমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা আদায় করেছেন।

মুসলমানের জীবনে মসজিদ সামরিক কেন্দ্র ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদ থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী পাঠানো ছাড়াও ইসলাম গ্রহণেচ্ছু প্রতিনিধিদলকে মসজিদেই স্বাগত জানান। এর উত্তম উদাহরণ হল, ৯ম হিজরীর তাবুক যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ (স) সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে তাঁবু তৈরি করেন। উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন মসজিদে কুরআন শুনে, মুসল্লীদেরকে নামায পড়তে দেখে এবং তাদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এ ছাড়াও তিনি যুদ্ধবন্দীদেরকে মসজিদে বেঁধে রাখতেন। এ ক্ষেত্রে সামামাহ বিন আসালের উদাহরণ দেয়া যায়। বন্দী অবস্থায় আসার পর রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে চিনতে পেরে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার হুকুম দেন। এবং তার সাথে ভাল ব্যবহারের আদেশ দান করেন। যদিও সবার সাথেই ভাল ব্যবহার করা হত। রসূলুল্লাহ (স) তার কাছে তিনদিন পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন কিন্তু সামামাহ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন। মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি গোসল করেন এবং নবী করীম (স)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। (বুখারী, কিতাবুস সালাত- ১ম খণ্ড)

ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে ঐ ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। নৈতিক প্রশিক্ষণ ও ইসলামী সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে উত্তম পদ্ধতি। মসজিদ আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও অন্তর থেকে অন্ধকার দূর করার উদ্দেশ্যে আলো বিকিরণের স্থান।

রসূলুল্লাহ (স) মসজিদের আঙ্গিনাকে সেনাবাহিনীর সমাবেশ এবং তাদের নেতা নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করেন। এর উত্তম উদাহরণ হল, হযরত আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হাবশীরা (নিগ্রো) মসজিদে নববীতে অস্ত্র নিয়ে খেলা শুরু করে। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখেন কিন্তু নিষেধ করেননি।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "হাবশীরা তাদের অস্ত্র নিয়ে ঈদের দিন মসজিদে খেলা শুরু করে। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডাকেন। আমি তাঁর কাঁধের ওপর মাথা রাখি এবং তাদের খেলা দেখি যে পর্যন্ত না আমি তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আসি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে বনী আরফেদা। খেলতে থাক। এতে তারা আরো উৎসাহিত হয় এবং খেলা অব্যাহত রাখে।"

সন্দেহ নেই যে, নিগ্রোদের ঐ খেলা নিছক খেল-তামাশা ছিল না। বরং এর মাধ্যমে তারা অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলেন। তারা শুধু খেল-তামাশা করলে রসূলুল্লাহ (স) অবশ্যই তাদেরকে নিষেধ করতেন। কেননা, মসজিদ খেলা-ধূলার জায়গা নয়। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যুদ্ধের জন্য মসজিদে সামরিক প্রশিক্ষণ জায়েয আছে।

রসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামকে মসজিদে তীর শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করতেন। যেন তারা যুদ্ধ ও শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন।

রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে যুদ্ধের পতাকা বাঁধেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামে উপনিবেশবাদ কিংবা শোষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অবকাশ নেই। ইসলামে শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সুযোগ আছে। কেউ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে বাধা দিলে এবং ইসলামের দাওয়াতী কাজে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। ইসলামের দাওয়াতী রোশনী প্রজ্জ্বলিত করার দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর। দাওয়াতী মশাল হাতে নিয়ে তারা গোটা দুনিয়ায় হেরার রশ্মি ছড়িয়ে অন্ধকার দূর করে দেবে। কিন্তু কেউ যদি বান্দার কাছে আল্লাহর সেই নূর পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি

করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসে। কিন্তু আল্লাহর বাতি নিভানোর প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরাজিত হলে, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। বরং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের কাছে সামান্য একটা জিযিয়া কর ধার্য করা হয়। তারা তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে তা আদায় করবে। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।

মসজিদে নিষিদ্ধ কাজ

মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (স) শিশু ও পাগলকে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মসজিদগুলো থেকে ছোট শিশু ও পাগলদেরকে দূরে রাখ। কেননা, তারা মসজিদের দেয়াল ময়লা করে এবং অপবিত্রতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারে না।" তাই দেখা যায়, অতীতে বাজারে কিংবা মসজিদের পার্শে পৃথক ঘর তুলে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত।

মসজিদে বেচা-কেনা কিংবা নিখোঁজ জিনিসের ঘোষণা দেয়া নিষিদ্ধ। কেননা, তা মসজিদের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আরবেও মক্তব ও ফোককানিয়া মাদ্রাসায় শিশুদের পৃথক ব্যবস্থার ঐ ধারা অব্যাহত রয়েছে। [১]

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فَقُوْلُوْا لاَاَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ -

"তোমরা যদি কাউকে মসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখ, তখন বল, আল্লাহ তোমার ব্যবসায় কোন লাভ না দিক এবং যদি কাউকে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখ, তাহলে বল, আল্লাহ তোমাকে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়।"

অনুরূপভাবে, মসজিদে খেলা-ধূলা করাও নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (স) এ হাদীসে ব্যবসার অকল্যাণ ও হারানো জিনিস না পাওয়ার জন্য বদ দোয়া করেছেন। [২]

---

১. রেসালাতুল মসজিদ ফিল ইসলাম-ডঃ আবদুল আযীয মুহাম্মদ লোমাইলাম।
২. নাইলুল আওতার- ২য় খণ্ড- পৃঃ ১৬৬।

মসজিদে হারাম

মক্কার বর্ণনা

কা'বা শরীফ ও মসজিদে হারাম সম্পর্কে আলোচনার আগে আসুন, আমরা প্রথমে মক্কা নগরী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি। মক্কা হচ্ছে, আল্লাহর এক
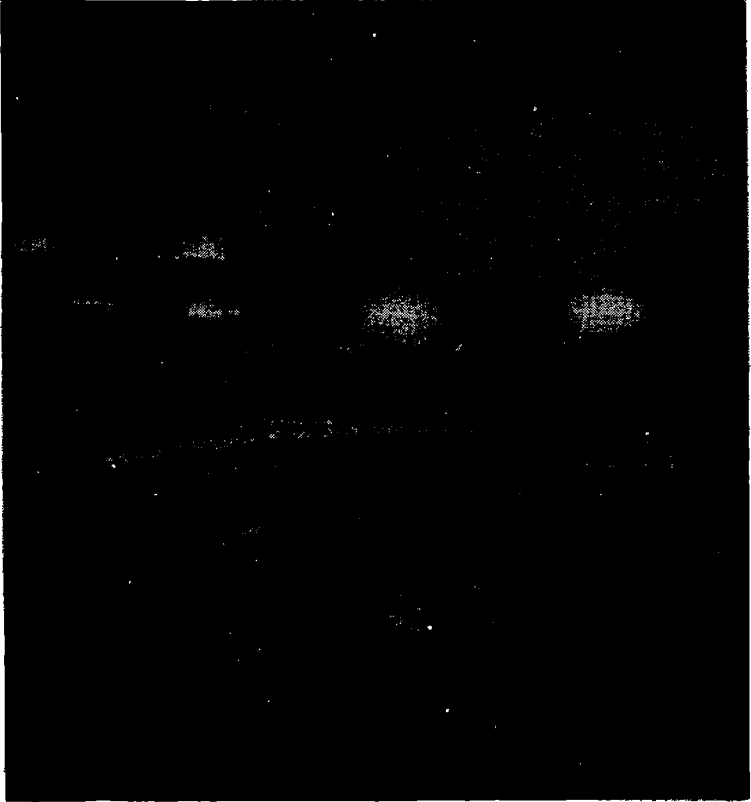
মসজিদে হারাম

বিরাট সৃষ্টি রহস্য। আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে মক্কাকে পবিত্র নগরী হিসেবে তৈরি করেছেন এবং তাকে ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছেন। মক্কা পাহাড়-পর্বতে ভরা এক বিরাট মরুভূমি। আবহাওয়া শুষ্ক। কিন্তু আধুনিক যুগের শহরায়ন ও

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের 'মক্কা শরীফের ইতিকথা' বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

আধুনিকীকরণের ফলে তা পৃথিবীর উন্নত ও সুন্দর শহরে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে জীবন ধারণের সকল সুযোগ-সুবিধে বিদ্যমান আছে।

মক্কা শরীফের রয়েছে 'হুদুদ' বা সীমানা। ঐ সীমানার ভেতরের অংশই আল্লাহর প্রিয় ও পবিত্র। আজকাল হুদুদের বাইরেও মক্কা শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে।

পবিত্র মক্কা ২১·৫০° অক্ষাংশে, ৪০° দ্রাঘিমা এবং সমুদ্রের স্তর থেকে ২৮০ মিটার ওপরে অবস্থিত। বছরে ৭ মাস গরম ও ৫ মাস ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডার পরিমাণ বেশী নয়, স্বাভাবিক। ঠাণ্ডার সময় তাপমাত্রা ৩০ সেন্টিগ্রেড এবং গরমকালে তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৪৮ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মক্কার বিভিন্ন অংশ রয়েছে। এর মধ্যে মক্কা উপত্যকা কিংবা ইবরাহীম উপত্যকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই কা'বা শরীফ এবং মসজিদে হারাম অবস্থিত।

মক্কার অনেক নাম আছে। এর মধ্যে মক্কা ও বাক্কা অন্যতম। এর অন্য নামগুলো হচ্ছে, উম্মুল কোরা, আল-কারুইয়া, আল-বালাদ, বালদাহ, মাআদ ইত্যাদি।

মক্কার মর্যাদা অনেক বেশী। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম, (হে মক্কা!) তুমি পৃথিবীতে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম যমীন। (তিরমিযী)

তাই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে দিয়ে এই সর্বোত্তম স্থানের সীমানা নির্ধারিত করেন এবং তাদের পাহারার মাধ্যমে একে সুরক্ষিত করেন। বর্ণিত আছে যে, জনমানবশূন্য মক্কায় সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) একা ভয় পান। তাই আল্লাহ সেই দিন থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। পরে ইবরাহীম (আ) জিবরীলের নির্দেশক্রমে সীমানা পুনঃ চিহ্নিত করেন। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (স) তামীম বিন উসাইদ আল-খোজায়ীকে দিয়ে পুনরায় নূতন করে সীমানা চিহ্নিত করেন।

মক্কায় পর্যায়ক্রমে, ফেরেশতা, জিন, হযরত আদম (আ) এবং আমালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে। আমালিক সম্প্রদায় চলে যাওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নির্দেশে, মক্কায় নিজ স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইলকে নির্বাসন দেন। হাজেরার অনুমতিক্রমে জোরহোম গোত্র মক্কায়

বসবাস শুরু করে। তখন থেকেই মক্কায় মানুষের অব্যাহত জীবন যাত্রা শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে মক্কা একটি নগর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠে।

মক্কায় কোন পানি ছিল না। কূপের পানিই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। বাইরের দেশ থেকে খাদ্য, তরি-তরকারী এবং ফলমূলের ওপর মক্কাবাসীদের জীবনযাত্রা নির্ভরশীল ছিল। স্থানীয়ভাবে তারা পশু পালন করে এবং গোশত ও পানির দ্বারা দিন অতিবাহিত করত। মক্কায় পানির প্রধান উৎস ছিল যমযম কূপ।

যমযমের রয়েছে বিরাট ইতিহাস। হযরত ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ইসমাইল ও নিজ স্ত্রী হাজেরাকে কা'বার স্থানের পার্শে অবস্থিত একটি বড় ছায়াদার গাছের নীচে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে চলে গেলেন। তখন কা'বা শরীফের স্থানটি একটি লাল টিলার মত উঁচু ছিল।

হাজেরার পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি সাফা-মারওয়া পাহাড়ে পানির সন্ধানে ৭ বার ছুটাছুটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন আওয়াজকারীর আওয়াজ শুনতে পান। তারপর কা'বার পাশে এসে দেখেন ইসমাইল (আ) এর পায়ের আঘাতে যমযম কূপের পানি উথলে উঠছে। তখন তিনি কূপের পানি আটকে রাখার জন্য বালির বাঁধ দেন এবং মশক ভর্তি করে পানি সংরক্ষণ করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ ইসমাইলের মা হাজেরাকে রহম করুন। তিনি যদি তাতে বাঁধ না দিতেন তাহলে, তা প্রবাহমান ঝর্ণাধারায় পরিণত হত।

গোটা দুনিয়ার সর্বত্র যমযমের পানি পান করা হচ্ছে। হাজী ও ওমরাহকারীরা সাথে করে দূর-দূরান্তরে সেই পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে দেখা যায়, যমযম একটি কূপ হলেও এর সেবা একটি নদীর মত। ইবরাহীম (আ)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার বছর যাবত বিশ্বব্যাপী ঐ পানি পান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগে হজ্জ মওসুমে দৈনিক ১৯ লাখ লিটার পানি সেবন করা হয়। সত্যিই যমযমের পানির পরিমাণ অপরিসীম।

যমযমের পানির ফযীলত অনেক বেশী, এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যমীনের সর্বোৎকৃষ্ট পানি হচ্ছে যমযমের পানি।" (ইবনে হিব্বান) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে যে নিয়তে যমযমের পানি পান করবে তার সেই মকসুদ পূরণ হবে; তুমি যদি রোগমুক্তির জন্য তা পান কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন; তুমি যদি পিপাসা

মিটানোর জন্য পান কর, তাহলে আল্লাহ তোমার পিপাসা দূর করবেন।" রসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন, "এটি ক্ষুধার সময় খাবারের কাজ করে।"

বর্তমান যুগে যমযমের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

কা'বার বর্ণনা

কা'বা ঘর হচ্ছে মুসলমানদের কেবলাহ। কা'বার দিকে মুখ করে দুনিয়ার সকল মুসলমান নামায আদায় করে। যমীনে যখন মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি তখন ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় কা'বা শরীফ নির্মাণ করে কা'বার তওয়াফ করেন।

তারপর যখন আদম (আ)-কে যমীনে পাঠানো হল, তখন তিনি মক্কায় এই কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে আল্লাহর ইবাদাত করেন। তিনি কা'বার তওয়াফ করেন ও হজ্জ পালন করেন। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আসমানে মক্কার কা'বা বরাবর মসজিদে বাইতুল মা'মূরের তওয়াফের নির্দেশ দেন। প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মূরের তওয়াফ করেন। তারা কিয়ামতের আগে ২য় বার আর সেই মসজিদের তওয়াফের সুযোগ পাবে না। এভাবে প্রতিদিন তওয়াফ চলছে।

যমীনের কা'বা তওয়াফকারী মানুষের জন্য বাইতুল মা'মূর তওয়াফকারী ফেরেশতারা দোয়া করেন। ফেরেশতাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। তবে যে সকল মানুষের আয়-রোজগার হালাল নয়, আল্লাহ তাদের ইবাদাত ও দোয়া কবুল করেন না।

ফেরেশতা ও আদম (আ)-এর তৈরি কা'বা দীর্ঘদিন পর মিটে গেছে। বিশেষ করে হযরত নূহের প্লাবনের সময় কা'বা ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) জিবরীলের ইঙ্গিতে পূর্বের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির ওপর দেয়াল নির্মাণ করে কা'বা পুনর্নির্মাণ করেন। ইতিহাসে কা'বা শরীফ নির্মাণকারীদের সংখ্যা ১১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন, ১. ফেরেশতা ২. আদম (আ) ৩. শীষ (আ) ৪. ইবরাহীম (আ) ৫. আমালেকা সম্প্রদায় ৬. জোরহোম গোত্র ৭. কুসাই বিন কিলাব ৮. কোরাইশ ৯. আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা) ১০. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং ১১. সুলতান মুরাদ।

কা'বা শরীফের দরজা বিশিষ্ট সামনের দেয়ালের দৈর্ঘ ৩৩ হাত, এর বরাবর পেছনের দেয়ালের দৈর্ঘ ৩২ হাত, হিজরে ইসমাইল এবং মীযাবে

কা'বার দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ ২৭ হাত এবং হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মাঝামাঝি দেয়ালের দৈর্ঘ ২০ হাত।

কা'বা শরীফের বর্তমান দরজা ২৮৬ কিলোগ্রাম খাটি সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বনী শায়বা গোত্র হচ্ছে কা'বার চাবি রক্ষক। কা'বা শরীফের দরজা খুলতে হলে, তাদের কাছে রক্ষিত চাবি এনে তা খুলতে হয়। রসূলুল্লাহ (স) বনি শায়বা গোত্রকে কা'বার চাবি রাখার চিরস্থায়ী অধিকার দিয়ে গেছেন।

কা'বা শরীফের পেছন দেয়ালে রয়েছে পাপমুক্তির স্থান। এটাকে আরবীতে 'আল-মোস্তাজাব' বলে। রোকনে ইয়ামানী থেকে কা'বা শরীফের পেছনে বিলুপ্ত দরজা পর্যন্ত ৪ হাত জায়গাকে মোস্তাজাব বলে। এখানে দোয়া করলে গুনাহ মাফ হয় এবং দোয়া কবুল হয়।

কা'বা শরীফের রোকনে ইয়ামানী অত্যন্ত সম্মানিত। রসূলুল্লাহ (স) একে হাতে স্পর্শ করেছেন। ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "রোকনে ইয়ামানীতে ৭০ জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। যারা সেখানে 'রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাহ ওয়াক্বেনা আযাবান্নার' এই দোয়াটি পড়বে, ঐ ফেরেশতারা আমীন বলবে।" (ইবনে মাজাহ)

কা'বা শরীফের দেয়ালের অন্য কোণে রয়েছে হাজরে আসওয়াদ। এটিকে তওয়াফের সময় চুমু দেয়া সুন্নাত। রসূলুল্লাহ (স) তাতে চুমু খেয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন 'এটি বেহেশতের পাথর।' এক হাদীসে এসেছে, 'তাতে ৭০ জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। তারা রুকূ সেজদাহকারী এবং তওয়াফকারীদের জন্য গুনাহ মাফ চায়।' (আল ফাকেহী) অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে, সে যেন আল্লাহর সাথে হাত মিলায় এবং মোসাফাহা করে।" (ইবনে মাজাহ)

হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজা মধ্যবর্তী স্থানকে মোলতাযাম বলে, রসূলুল্লাহ (স) এটি আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছিলেন। এটি দোয়া কবুলের জায়গা। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মোলতাযাম দোয়া কবুলের স্থান, এখানে যে দোয়া করবে তা অবশ্যই কবুল হবে।"

কা'বার ছাদের পানি সরার জন্য একটি নল লাগানো হয়েছে। সেই নলকে মীযাব বলে। আতা (রা) বলেছেন, মীযাবের নীচে দোয়া কবুল হয়। (আখবারে মক্কা, আযরাকী)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'কা'বা শরীফের দিকে নজর করা ইবাদাত।' অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, কা'বা শরীফের ওপর প্রত্যেক দিন ও রাত ১২০ টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে তওয়াফকারীদের জন্য ৬০টি, এতেকাফকারীদের জন্য ৪০ টি এবং কা'বার প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের জন্য ২০টি রহমত নাযিল হয়। অন্য এক বর্ণনায় নামাযীদের জন্য ৪০টি রহমত নাযিলের কথা উল্লেখ আছে।

কা'বা শরীফের চারদিকে তওয়াফ করা বিরাট সওয়াব, তওয়াফ করলে গুনাহ মাফ হয়, আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং গোলাম আযাদের সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহর যিকরের জন্যই তওয়াফের বিধান চালু হয়েছে। তওয়াফ নামাযের হুকুমের অধীন, নামাযের সাথে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, নামাযে কথা বলা যায় না, তবে তওয়াফে প্রয়োজনীয় কথা বলা যায়। তাই তওয়াফ করার সময় ভাল কথা ছাড়া অন্য ধরনের কথা বলা যাবে না।

কা'বা শরীফের উত্তর পার্শ্বের অর্ধবৃত্ত দেয়ালের ভেতরের গোলাকার স্থানকে হিজরে ইসমাইল বলা হয়। হযরত ইসমাইল তাতে বাস করতেন এবং তাতে ভেড়া-বকরী রাখতেন। কথিত আছে যে, এখানেই তাঁর এবং তাঁর মা হাজেরার কবর আছে।

অপরদিকে কোরাইশরা কা'বা নির্মাণের সময় অর্থাভাবে উত্তর দিকে কাবার সাড়ে ৬ হাত অংশ ছেড়ে দেয় যা এখন হিজরে ইসমাইলের সাথে মিশে আছে। একে হাতীমে কা'বা বলা হয়। একবার হযরত আয়েশা (রা) কা'বার ভেতর নামায পড়তে চেয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে হাতীমে কা'বায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন, এখানেই নামায পড়, যদি তুমি কা'বার ভেতর নামায পড়তে চাও। কেননা, এটি কা'বারই অংশ।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) আবু হোরায়রা (রা) কে বলেছেন, হিজরে ইসমাইলের দরজায় একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি তাতে দু'রাকাত নামায আদায়কারী মুসল্লীর উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, 'তোমার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, এখন থেকে নতুনভাবে আমল কর।'

মসজিদে হারামের বর্ণনা

কা'বা শরীফের চারদিকের খালি স্থানকে মসজিদে হারাম বলা হয়। যেখানে তাওয়াফ করা হয় এটাকে মাতাফ বলে। এটিই মসজিদে হারাম। ক্রমান্বয়ে মসজিদে হরামের সম্প্রসারণ হয় এবং পরবর্তীতে মসজিদের বিশাল ভবন তৈরি হয়।

১৭ হিজরীতে, সর্বপ্রথম হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করেন এবং সর্বশেষ সম্প্রসারণ করেন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয ১৪০৯ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ।

বর্তমানে মসজিদে হারামে ৩টি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিঁড়ি চালু আছে।

মসজিদে হারামে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশী। আমর বিন আস রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, "হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের দুটো মূল্যবান ইয়াকুত পাথর, আল্লাহ ঐ দু'টো পাথরের জ্যোতি মিটিয়ে দিয়েছেন। তা না করা হলে, এ দু'টোর আলোতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড আলোকোজ্জ্বল হয়ে যেত।" (তিরমিযী)

তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নাত।

মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাযে অন্য স্থানের এক লাখ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। অন্যান্য ইবাদাতের সওয়াবও এক লাখ গুণ বেশী হয়। নারী-পুরুষ সবাই মসজিদে হারামে নামায পড়ে। তাই প্রতি বছর হজ্জ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মক্কায় আসে এবং মসজিদে হারামে আল্লাহর ইবাদাত করে।

হজ্জের রয়েছে বিরাট সওয়াব। হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আরাফার দিবসে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাহর প্রার্থনার অপেক্ষা করেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আরাফার দিনের চাইতে অন্য কোন দিন আল্লাহ তাঁর এতবেশী বান্দাহকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেন না।"

অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আরাফাতের দিনের চাইতে শয়তানকে অন্য কোন দিন এত বেশী ছোট, অভিশপ্ত, ঘৃণিত ও রাগান্বিত দেখা যায়নি।"

মসজিদে হারামকে কেন্দ্র করেই হজ্জসহ আল্লাহর বহু রহস্য লুকায়িত রয়েছে। আর হজ্জে রয়েছে মানুষের বিরাট কল্যাণ।

মসজিদে হারামের ভূমিকা

হযরত আদম (আ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক কা'বা শরীফ নির্মাণ করে তাতে খালেসভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ ও আইন পালনের মাধ্যমে এটিকে বিশ্ব মুসলমানের আনুগত্যের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের রূপ দান করেন। একই কারণে তিনি কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। সেদিন পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও বিধান ছাড়া আর কোন কিছু ছিল না। মানুষ বহু পরে এসে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেরাই বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার করে অশান্তির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। শান্তির মালিককে বাদ দিয়ে এবং তার বিধান থেকে দূরে সরে শান্তি আনার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পরবর্তীতে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত আদম (আ)-এর তৈরি ভিত্তির ওপর পুনরায় কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। কা'বা পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যও একই। আর তা হচ্ছে, পুনরায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্যের জন্য বিশ্বের মানুষকে আহবান জানানো।

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত যে সকল নবী কা'বা শরীফে হাজিরা দিয়েছেন, তাদের সবার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হল, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে তাওহীদের অনুসরণ করা, আল্লাহ ছাড়া আর কারুর আদেশ-নিষেধ না মানা এবং আল্লাহ বিরোধী সকল মত ও পথ থেকে লোকদেরকে দূরে রাখা।

দাওয়াতে দীন ঃ উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত মসজিদে হারাম ছিল দীনের দাওয়াতী কেন্দ্র। এখান থেকে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয়া হত।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও কা'বা শরীফ এবং মসজিদে হারামকে কেন্দ্র করে দীনের দাওয়াত দেন। তাদানীন্তন সমাজের মানুষ আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে শেরক ও বিদআত এবং কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। তারা মূর্তি পূজা করত। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং আইন-কানুনের পরিবর্তে মনগড়া ধ্যান-ধারণা ও ভ্রান্ত মতবাদ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করত। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান এবং সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা বলে চিহ্নিত করেন। কেননা, সেগুলোর উৎসমূলে

আল্লাহর বিধান কার্যকর ছিল না। তিনি কা'বা শরীফের পার্শে অবস্থান করতেন এবং ইবাদাত করতেন। আর পার্শ্ববর্তী দারুল আরকামে গোপনে দীনের তা'লীম দিতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সাফা পাহাড়ে সবাইকে জড় করে দীনের দাওয়াত দেন এবং মসজিদে হারামে বসে মে'রাজের বর্ণনা পেশ করেন। তিনি মসজিদে হারামে সুযোগমত দীনের দাওয়াত দিতেন।

তবে এ কথা সত্য যে, রসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় মসজিদে হারামের সেই ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা ততটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেনি যতটুকু মদীনার মসজিদে নববীর ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার প্রধান কারণ হল, মক্কার কোরাইশদের অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈরিভাবের কারণে তিনি মক্কায় দাওয়াতে দীন ও দীনের অন্যান্য বিষয়ে বেশী কিছু করতে পারেননি। যে কারণে তাঁকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল। অপরদিকে, মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে দীন প্রচারে বাধা ছিল না। সে জন্য তিনি দীনের সকল বিভাগে কাজ করে তাকে বিশাল বৃক্ষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে মক্কার কাফেররা ইসলামের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল।

এ ছাড়াও মক্কাবাসীরা ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যাপক হারে ইসলামে প্রবেশ করেনি। ফলে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মদীনার তুলনায় মক্কায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সহ অন্যান্য ভূমিকা বেশী পালন করতে পারেননি। যদিও কা'বা শরীফ যুগ যুগ ধরে ঈমান ও জ্ঞান চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল।

জ্ঞান সেবা : মক্কা বিজয়ের পর হোনাইনে যাত্রার আগে রসূলুল্লাহ (স) হযরত মোআয বিন জাবালকে মক্কায় রেখে যান। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি মক্কাবাসীকে এলেম ও ঈমান শিক্ষা দেবেন, ইসলামের হালাল–হারাম ও ফরয ওয়াজিব সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তাদেরকে কুরআন শিখাবেন।

হযরত মোআয আনসার যুবকদের মধ্যে বিদ্যা–বুদ্ধি, আদব–শিষ্টাচার প্রজ্ঞার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তিনি ইসলামের আইনশাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। সে জন্য রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে পাঠান। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে মোআয! যদি তোমার কাছে কোন মামলা আসে, তুমি কিভাবে বিচার করবে?' তিনি জবাব দেন, 'আল্লাহর কুরআনের আইন মোতাবেক ফয়সালা করবো।' রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'যদি কুরআনে তা না থাকে?' মোআয বলেন, 'তাহলে রসূলুল্লাহর হাদীস অনুযায়ী ফয়সালা করবো।' রসূলুল্লাহ (স) আবারও জিজ্ঞেস করেন,

'যদি তাতেও না থাকে?' তখন মোআয বলেন, 'আমি ইজতেহাদ করবো।' তখন রসূলুল্লাহ (স) মোআযের বুকে থাপ্পড় লাগিয়ে বলেন, 'আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রতিনিধিকে রসূলুল্লাহর (স)–এর পসন্দসই কাজ করার তওফীক দিয়েছেন।' [১]

হযরত মোআয থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সহ অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একাধারে হাদীস ও ফেকহ বিশারদ ছিলেন।

সম্ভবত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান সেবাই মসজিদে হারামের সর্ববৃহৎ জ্ঞান চর্চা ছিল। তখন মুসলিম বিশ্বে মক্কার জ্ঞান চর্চার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মসজিদে হারামে কুরআনের তাফসীর পেশ করতেন, লোকদেরকে উন্নত চরিত্রের পথ প্রদর্শন করতেন এবং ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন শিক্ষা দিতেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) সম্পর্কে মহানবী (স) আগেই বলে গেছেন, هُوَ حِبْرُ الْأُمَّةِ وَتَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ 'তিনি উম্মাহর পণ্ডিত ও কুরআনের ভাষ্যকার।' তিনি তাঁর জন্য আরও দোয়া করেছিলেন যে, – اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

"হে আল্লাহ! তাকে দীন বুঝার তওফীক দাও এবং ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা দাও।"

ইবনে আব্বাসের শিক্ষা বৈঠকে মক্কার ভেতর ও বাইরের বহু লোক যোগ দিত এবং হজ্জের মওসুমে বৈঠকের পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত হত। ইবনে আব্বাসের মসজিদে হারামের শিক্ষালয় থেকে বিরাট বিরাট জ্ঞানী–গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তৈরি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত মোফাস্‌সের ও মুহাদ্দিস মোজাহিদ বিন জোবায়ের, আতা ইবনে আবি রেবাহ, তাউস ইবনে কিসান, সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও ইবনে আব্বাসের গোলাম একরামাহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মসজিদে হারামের শিক্ষালয় থেকে এভাবে শিক্ষার্থীরা যুগের পর যুগ শিক্ষালাভ করে বেরিয়েছেন। সেখানকার শিক্ষক সুফিয়ান বিন উয়াইনাহর কাছ থেকে ইমাম শাফেঈ (র) শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রখ্যাত আলেম আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ মক্কার শিক্ষালয়ের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনিই প্রথম হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ ছিলেন অন্যতম। ইমাম শাফেঈ (র)

---

১. তাবকাতে কোবরা – ২য় খণ্ড।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "যদি মালেক ও ইবনে ওয়াইনাহ না থাকত, তাহলে হেজাযের এলেম বিদায় নিত।" তিনি মদীনার ইমাম মালেক ইবনে আনাস ও মক্কার সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে ঐ মন্তব্য করেন।

সাহাবী, তাবেঈ ও তাবয়ে তাবেঈনের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্তও মসজিদে হারামে শিক্ষার আসর অব্যাহত রয়েছে। হজ্জ ও রমযান মওসুমে তা আরো বেশী জমজমাট হয়। বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম নানা প্রকার মাসলা-মাসায়েল ও ফতোয়া দান করেন এবং লোকজনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

রাজনৈতিক ভূমিকা ঃ মসজিদে হারামের সেবা শুধু দাওয়াতে দীন, জ্ঞান ও সমাজ সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এ বিশ্ব শ্রেষ্ঠ মসজিদের রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভূমিকা। এখন আমরা এ সম্পর্কে কিছু ঘটনার উল্লেখ করবো।

মসজিদে হারামের দারুন নাদওয়া কোরাইশদের পরামর্শ সভা ছিল। তারা সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত নিত।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণটি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেছেনঃ

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি নিজ ওয়াদা সত্য প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং সকল দলকে পরাজিত করেছেন। সাবধান! (জাহেলিয়াতের) সকল লেন-দেন ও রক্তপণ আমার দু'পায়ের নীচে, তবে কা'বা শরীফের সেবা ও হাজীদের পানি পান পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সাবধান! ইচ্ছাকৃত হত্যার কাছাকাছি ভুল হত্যার ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত হচ্ছে ১শত উট।

হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জাহেলিয়াতের গর্ব-দর্প উঠিয়ে নিয়েছেন এবং বাপসহ পূর্ব পুরুষের অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ -

হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী অর্থাৎ যে সর্বাধিক আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে।

(সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৩)

হে কোরাইশ! তোমাদের সাথে আমি কি ধরনের আচরণ করবো বলে তোমরা মনে কর? তারা বলল, আমরা ভাল আচরণ আশা করি, আমরা আপনাকে সম্মানিত ভাই ও ভাতিজা মনে করি। তারপর তিনি বলেন, 'যাও তোমরা মুক্ত।"[১]

এ ভাষণে মানবাধিকার সহ মানুষের যাবতীয় অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) মক্কায় খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মসজিদে হারামকেই তাঁর প্রধান কর্মস্থল হিসেবে ব্যবহার করেন। এখানে বসেই তিনি মক্কার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াযীদের যুদ্ধের সময় তিনি মসজিদে হারাম ও কা'বা শরীফে আশ্রয় নেন। তাঁর গোটা খেলাফত মসজিদে হারামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে তার সরকারের ভবিষ্যত নীতি ঘোষণা করেন। ভাষণে তিনি নিজেকে শক্তিশালী শাসক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমি হযরত ওসমানের মত দুর্বল খলীফা নই এবং মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের মত উদারপন্থী নই।"[২]

আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর মক্কায় আসেন এবং মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "আমি যমীনে আল্লাহর মনোনীত সুলতান। আমি তাঁর সাহায্য ও তাওফীকের মাধ্যমে তোমাদের ওপর শাসন করছি। তাঁর সম্পদের আমি পাহারাদার; তাঁর ইচ্ছায় আমি তা খরচ করছি, তাঁর হুকুমে আমি তা দান করি, তিনি আমাকে সম্পদের তালা বানিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে খুলে দিতে পারেন যেন আমি তোমাদেরকে দান করতে পারি এবং ইচ্ছা করলে আমাকে বন্ধ রাখতে পারেন। তোমরা আল্লাহর আগ্রহী

---

১. ইবনে কাসীর-আস্-সীরাতুন নবুবিয়াহ- ৩য় খণ্ড, ৫৭০ পৃঃ।
২. আল-ইক্‌দুল ফরীদ- ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

হও এবং আজকের এ দিনে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও। তিনি তোমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।'[১]

আব্বাসী শাসনকাল শেষ হওয়ার পর দাউদ ইবনে আলী মক্কায় দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেন, "আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কোন নদী প্রবাহিত করা কিংবা রাজপ্রাসাদ তৈরির জন্য বের হইনি। আমার ধারণা, আল্লাহর দুশমনগণ আর বিজয় লাভ করতে পারবে না। এখন অবস্থা সঠিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে এবং সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়েছে। তীর তার ধনুকের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়েছে। নবীর বংশধরের মধ্যে দয়ালু লোক রয়েছে। আপনারা আল্লাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলুন, আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বানাবেন না। কেননা এর ফলে আল্লাহর নেয়ামত দূরে সরে যাবে।"[২]

হেজাযের শাসকরা সর্বদাই মসজিদে হারামের জুমআর খোতবায় নিজেদের নীতি ঘোষণা করতেন এবং তারা কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা খোতবাহ দিতেন। আজ পর্যন্তও মসজিদে হারামের জুমআর খোতবায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকদের নীতি ও তৎপরতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত মসজিদে হারামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তাঁর আইন ও তাঁর প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির সকল দিক ও বিভাগে আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মসজিদে হারামের এ ভূমিকা সর্বকালের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

---

১. আল–ইকদুল ফরীদ– ৪র্থ খণ্ড, পৃ ঃ ১৬২।
২. ঐ ৪র্থ খণ্ড।

মসজিদে আকসা

জেরুসালেমের বর্ণনা

মসজিদে আকসা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জেরুসালেম শহর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

এ শহরেই মসজিদে আকসা অবস্থিত। এটি একটি বহুজাতিক শহর ও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তীর্থকেন্দ্র। মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদীরা শহরটিকে পবিত্রস্থান মনে করে। শহরটির গোড়াপত্তন করেন আরব ইয়াবুসী গোত্রের মালেক সাদেক। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন বলে তাকে সালেম বলা হয়। তার নামানুসারেই শহরের জেরুসালেম নামকরণ করা হয়।

এ শহরের সাথে হযরত ইবরাহীম, ইয়াকুব, দাউদ, সোলাইমান, মূসা, মরিয়ম, ঈসা, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ইতিহাস জড়িত রয়েছে। কাজেই এত নবীর ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেরুসালেম। আল্লাহ্ কুরআনে শহরটিকে বরকতময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, اَلَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ

"আমরা মসজিদে আকসার আশ-পাশ বরকতপূর্ণ করে দিয়েছি।"

(বনি ইসরাঈল : ১)

মসজিদে আকসার বর্ণনা

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করি, যমীনে প্রথম মসজিদ কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বলেন, 'মসজিদে হারাম।' আমি জিজ্ঞেস করি, এরপর কোন্‌টি? তিনি বলেন, 'মসজিদে আকসা।' আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করি, এ দু'টোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বলেন, '৪০ বছর'।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মসজিদে আকসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের বই 'আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা' পড়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইবনুল যাওজী বলেছেন, সোলায়মান (আ) মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা নন। বরং তিনি হচ্ছেন পুনর্নির্মাণকারী। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের মধ্যে কেউ তাঁর কা'বা শরীফ পুনর্নির্মাণের ৪০ বছর পর মসজিদে আকসা তৈরি করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম (আ)-এর ১ হাজার বছর পর সোলাইমান (আ)-এর আগমন ঘটে।
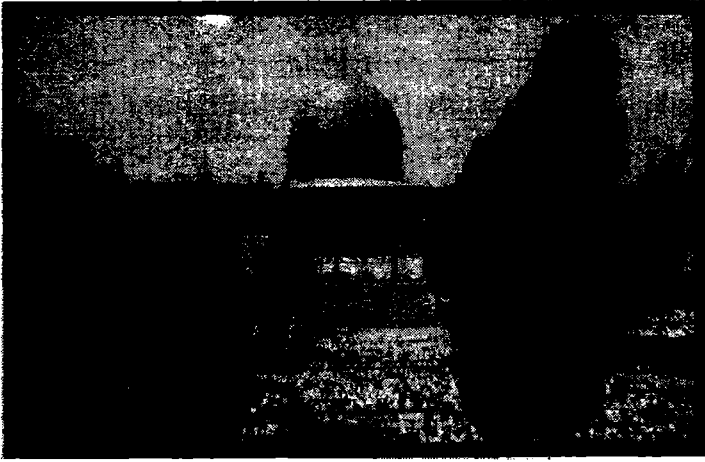
মসজিদে আকসা

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইবরাহীম (আ) কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর নিজেই মসজিদে আকসা তৈরি করেন।[১] 'মসজিদে আকসা'র অর্থ দূরবর্তী মসজিদ। সম্ভবত এটি মক্কা থেকে দূরে বলে এটিকে মসজিদে আকসা বলা হয়েছে, মেরাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআনের সূরা ইসরাঈলে সর্বপ্রথম 'মসজিদে আকসা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর আগে এর নাম ছিল বায়তুল মাকদেস।

বর্তমানে মসজিদে আকসা নামে যে মসজিদ ভবন আছে তা শুধু মসজিদে আকসা নয়। ইসলামী শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে মসজিদের সীমানার চার দেয়ালের ভেতরের সবটুকু অংশই মসজিদে আকসা। এর ভেতর মসজিদ গম্বুজে সাখরা, মসজিদে নেসা ও বিভিন্ন মাদ্রাসাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মসজিদে আকসা পুরাতন জেরুসালেম শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

---

[১] কাবলা আন্ ইউহান্দাসা আল-আকসা- আবদুল আযীয মোস্তফা- দারুল ওয়াতান প্রকাশনী, সৌদী আরব- প্রকাশকাল-১৯৯০ পৃঃ

রসূলুল্লাহ (স) মেরাজের সময় মসজিদে আকসায় যান এবং সেখানে সকল নবীর রূহানী উপস্থিতিতে তাঁদের নামাযের ইমামতি করেন। তিনি মে'রাজ থেকে ফিরে আসার সময় পুনরায় সেখানে অবতীর্ণ হন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিয়ে পুনরায় নামায পড়েন। তিনি মসজিদের দেয়ালের সাথে মক্কা থেকে আসা বোরাক বেঁধে যান এবং মে'রাজ থেকে ফিরে এসে পুনরায় সেই বোরাকে আরোহণ করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রসূলুল্লাহ (স) যে তিন মসজিদ সফরের অনুমতি দিয়েছেন, তার মধ্যে মসজিদে আকসা অন্যতম। এটা মুসলমানদের প্রথম কেবলাহ ছিল এবং রসূলুল্লাহ (স)–সহ মুসলমানরা ১৭ মাস মসজিদে আকসার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন।

অন্য মসজিদের চাইতে মসজিদে আকসায় নামাযের ফযীলত পাঁচশ গুণ বেশী। অন্য এক বর্ণনায় ১ হাজার গুণ বেশী সওয়াবের কথা উল্লেখ আছে। নামায ছাড়াও অন্যান্য ইবাদাতেরও অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, "কেউ যদি বেহেশতের কোন অংশ দেখতে চায়, সে যেন বায়তুল মাকদেসের দিকে তাকায়।" (আ'লামুল মাসাজেদ)

দেয়াল ঘেরা এলাকার দক্ষিণাংশে মসজিদে আকসার বর্তমান বিল্ডিং অবস্থিত। চার দেয়ালের ভেতরের মোট পরিমাণ হচ্ছে, ১ লাখ ৪০ হাজার ৯ শ বর্গমিটার। মসজিদের রয়েছে ১১ টি দরজা। এতে নয়টা গম্বুজ ও ৩টি মিনারা আছে।

খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মসজিদে আকসা নির্মাণ শুরু করেন এবং তার ছেলে ওয়ালিদ তা সমাপ্ত করেন। মসজিদ বিল্ডিং এর দৈর্ঘ হচ্ছে, ৮০ মিটার ও প্রস্থ ৫৫ মিটার। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালকে 'বোরাক শরীফ' বলা হয়। রসূলুল্লাহ (স) এতে বোরাক বেঁধেছিলেন।

মসজিদ গম্বুজে সাখরা

৬৯১ খৃঃ মোতাবেক, ৭০ হিজরীতে, খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মসজিদ গম্বুজে সাখরা তৈরি করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, ভূপৃষ্ঠে এটাই হচ্ছে, সর্বাধিক সুন্দর ইমারত।

'সাখরা' শব্দের অর্থ পাথর, পাথরের ওপরেই গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি তৈরি হয়েছে। পাথরটির রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। বর্ণিত আছে প্রথমে

মসজিদে গম্বুজে সাখরা

আদম (আ) এই পাথরের কাছে নামায পড়েন। ইবরাহীম (আ) এর কাছে নিজ ইবাদাতখানা তৈরি করেছেন। ইয়াকুব (আ) এর উপর আগুনের স্তম্ভ দেখে সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। ইউশা (আ) এর উপর গম্বুজ নির্মাণ করেন। দাউদ (আ) এর কাছে মেহরাব এবং সোলায়মান (আ) প্রসিদ্ধ ইবাদাতগাহ 'হাইকালে সোলাইমানী' তৈরি করেছিলেন। আর এই পাথরের ওপর রসূলুল্লাহ (স) বসেন ও মেরাজের রাতে এর ওপর থেকেই আসমানে যান।

এটা মূলত মসজিদ নয়। পাথরের হেফাজতের জন্যই সেখানে বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। তবুও লোকেরা তাতে পৃথক পৃথক ভাবে নামায পড়ে। নামাযের মূল জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে আকসায়।

মসজিদে সাখরার ইমারত ৮ কোণ বিশিষ্ট। এতে ৫৬ টি জানালা রয়েছে। মসজিদে রয়েছে একটি অত্যন্ত সুন্দর গোলাকার গম্বুজ। এই কারণে একে মসজিদ গম্বুজে সাখরা বলা হয়।

পাথরের নীচে রয়েছে একটি গুহা। গুহার ওপর পাথরটিকে আসমান ও যমীনের শূন্যস্থানে ঝুলন্ত বলে মনে হয়। গুহার আয়তন হচ্ছে, ৭ X ৫ মিটার। ওপর থেকে গুহার ভেতরে যাওয়ার জন্য রয়েছে ১৪টি স্তর বা সিঁড়ি।

মসজিদে আকসা ও সাখরা আজ ইসরাইলের জবর দখলে। ১৯৬৭ সালের ৫ই জুন, যুদ্ধের মাধ্যমে ইহুদীরা মসজিদে আকসা ও জেরুসালেম নগরী মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। আজ ফিলিস্তিনী মুসলমানরা তা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বও সে জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু দীর্ঘ ২৩ বছর যাবতও তা মুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ইহুদীরা জেরুসালেমকে ইসরাইলের স্থায়ী রাজধানী ঘোষণা দিয়ে বলেছে, তারা কখনও তা হাতছাড়া করবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ প্রয়োজন, মুসলমানদের সকল শক্তি সামর্থ একত্র করে জেরুসালেম ও মসজিদে আকসা পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ শুরু করা। মুসলিম দেশ ও সরকার এবং ওলামা ও ইসলামী সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে ঐ জিহাদ পরিচালনা করতে হবে।

মসজিদে আকসার ভূমিকা

মসজিদে আকসা ইসলামের সুমহান নেতৃস্থানীয় মসজিদসমূহের অন্যতম। অতীতে এ মসজিদ বহুমুখী ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে মসজিদটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ ও সোলাইমান (আ) কর্তৃক পুনর্নির্মাণের পর হাজার হাজার বছর ধরে এটি ছিল বহু সংখ্যক আম্বিয়ায়ে কেরামের দীনী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র। তদানীন্তন যুগের জন্য এটি ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র যাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন নবী ও বাদশাহরা এখান থেকেই জেরুসালেম ভিত্তিক রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

মসজিদে আকসা মূলত সভ্যতা ও তমদ্দুনের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনন্য প্রতীক। এটি ইসলামী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারক।

মসজিদে আকসায় ইসলামী শিক্ষাদান করা হত এবং তা আজ পর্যন্তও অব্যাহত রয়েছে। বরং এর চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ও লাইব্রেরী। অর্থাৎ সেখানে রয়েছে দারুল কুরআন, দারুল হাদীস ও বোর্ডিং। সেগুলোতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট পর্যায়ে শিক্ষাদান অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়াও তাতে আরবী ভাষা, ইসলামী আইন, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়।

মোট কথা, মসজিদে আকসায় দীনী শিক্ষার সাথে সাথে ইতিহাস, অংকে, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনসহ অন্যান্য দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত।

ওলামায়ে কেরাম, বিচারকমন্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মসজিদে আকসায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করতেন।

এ মসজিদ থেকেই তদানীন্তন শাসকরা জনগণের উদ্দেশ্যে সরকারী পয়গাম ও বক্তৃতা-বিবৃতি প্রকাশ করতেন সেগুলো সেখানে পাঠ করার পর তা জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হত।

মসজিদে আকসার ভেতর অবস্থিত বিভিন্ন মাদ্রাসায় বহু প্রখ্যাত আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তি শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে মাদ্রাসা নাসারিয়ায় শেখ আবুল ফাতহ নাসার বিন ইবরাহীম আল-মাকদেসী অন্যতম। ইমাম গাযালী এবং আবু বকর বিন আল-আরবী তাঁর সাথে সেখানে সাক্ষাত করেন। পরবর্তীতে ইমাম গাযালী মসজিদে আকসায় বসে একটি বই লেখেন। বইটির নাম হচ্ছে, 'আর-রেসালাতুল কোদ্সিয়াহ ফি কাওয়ায়েদিল আকায়েদ।' এ বিষয়টি তিনি 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আজ মসজিদে আকসা ইসরাইলের ইহুদীদের জবরদখলে থাকার কারণে মসজিদের পূর্বের ভূমিকা এখন আর নেই। মসজিদ ইহুদীদের জবরদখল থেকে মুক্তি লাভ করার পর আবার তার আকাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

মসজিদে কুবা

মসজিদে কুবা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন, "যে মসজিদের ভিত্তি ১ম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতেই আপনার নামায পড়া বেশী যুক্তিসঙ্গত। তাতে এমন সব লোক রয়েছেন যারা অধিকতর পবিত্রতা পসন্দ করেন। আল্লাহ বেশী পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।"

(সূরা তাওবাহ ঃ ১০৮)
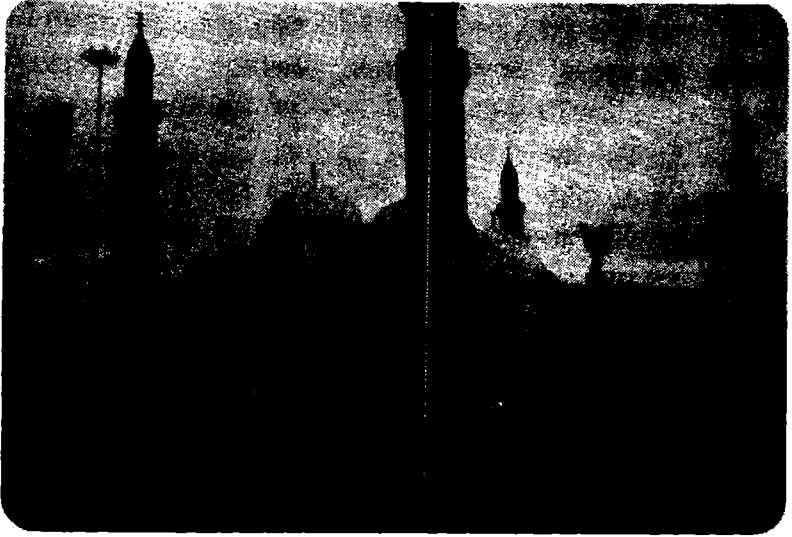
মসজিদে কুবা

কুবা একটি কূপের নাম। কূপের নামানুসারেই মসজিদের ঐ নামকরণ করা হয়েছে। এটি মদীনার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। মজসিদে নববী থেকে এর দূরত্ব তিন কিলোমিটার। এটি একটি কৃষি প্রধান এলাকা। কিন্তু বর্তমানে তাতে শহর সম্প্রসারিত হওয়ায় কৃষি যমীন সংকুচিত হয়ে আসছে।

রসূলুল্লাহ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে প্রথমে কুবায় আসেন এবং এখানে বনী আমর বিন আওফ গোত্রের কাছে কয়েকদিন অবস্থান করেন। তিনি সর্বপ্রথম কুবায় এ মসজিদটি তৈরী করেন। মসজিদ নির্মাণের কাজে তিনি নিজে ও সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন।

সর্বপ্রথম, হযরত ওসমান (রা) মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। বিভিন্ন শাসকদের আমলে মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়। সর্বশেষ সম্প্রসারণ করেন সৌদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয। বর্তমানে মসজিদের আয়তন হচ্ছে ১৩ হাজার ৫শ বর্গমিটার। এতে মহিলাদেরও নামাযের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে আঙ্গিনাসহ মসজিদে মোট ২০ হাজার লোক নামায পড়তে পারে। মসজদিের সাথেই রয়েছে একটি পাঠাগার।

রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঘরে অজু করে মসজিদে কুবায় এসে নামায পড়ে, সে একটি ওমরাহর সওয়াব পাবে।" (ইবনে মাজাহ) রসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, 'মসজিদে কুবার নামায ওমরাহর সমান।' (তিরমিযী)

মসজিদে কুবার ভূমিকা

রসূলুল্লাহ (স) প্রতি শনিবারে পায়ে হেঁটে কিংবা সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে মসজিদে কুবা যেয়ারত করতেন। রসূলুল্লাহর অনুসরণে মসজিদে কুবার যেয়ারত সুন্নাত।

মজসিদে কুবার যেয়ারত ঃ যেয়ারতকারীর প্রাণে হিজরতের ঘটনাসমূহের স্পন্দন জাগায়, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)–এর প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ আন্দোলনের স্মৃতির জোয়ার সৃষ্টি করে। রসূলুল্লাহ (স)–এর পাশে আনসার ও মোহাজেরদের জিহাদ, অটল ভূমিকা ও সর্বাত্মক ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনাসমূহ জাগ্রত করে। যার ফলে, শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় ও অসত্যের পরাজয়, শিরক ও বাতিলের ওপর তাওহীদ ও হেদায়াতের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

এটা সেই মসজিদ যেখান থেকে মদীনায় ইসলামের সূচনা হয় এবং যে পল্লীতে রসূলুলাহ (স)–কে সর্বাত্মক স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয়। তাই এটিও সম্মানিত। এ মসজিদে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে জ্ঞান চর্চা ও ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রসূলুল্লাহ (স)–এর প্রথম মসজিদ হিসেবে এই মসজিদে তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুশীলন করা হয় মসজিদে নববীর অনুকরণে।

ইমাম গাযালী তাই উল্লেখ করেছেন যে, মসজিদে কুবায় শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হত।[১] লোকেরা তাতে অংশগ্রহণ করত এবং তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এ মসজিদের প্রতি সবার আকর্ষণ বেশী। এ মসজিদের যেয়ারত উত্তম।

---

১. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন–১ম খন্ড।

ইরাকের মসজিদ

মসজিদে বসরা

জাযীরাতুল আরব বা আরব দ্বীপের বাইরে নির্মিত প্রথম মসজিদ হচ্ছে মসজিদে বসরা। ১৪ হিজরীতে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। ইসলামের বিজয় শুরু হওয়ার পর বাইরে এটাই সর্বপ্রথম মসজিদ। ওতবাহ ইবনে গাজওয়ান বসরায় পৌছার পর এক খণ্ড যমীন মসজিদের জন্য নির্ধারণ করেন এবং বাঁশ দিয়ে তা তৈরী করেন। ৪৪ হিজরীতে বসরায় হযরত মুআবিয়ার গভর্ণর যিয়াদ বিন আবীহ তা ইট ও চুন দিয়ে পাকা করেন এবং মসজিদের প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন।

কোন শহর বা গ্রামে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেননা, এটা রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত। রসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম কুবায় ও পরে মদীনায় মসজিদ তৈরী করেন। বরং এটা হচ্ছে, মুসলিম সভ্যতার উজ্জ্বল ছাপ বা বৈশিষ্ট্য।

উমাইয়া শাসনামলে, মসজিদে বসরা সাহিত্য ও জ্ঞানের পুনর্জাগরণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাতে বহু ফকীহ ও আলেম এলেম চর্চা করেছেন। তাদের মধ্যে হাসান বসরী (র) উল্লেখযোগ্য। তিনি মসজিদে নববীতে রাবীআতুর রায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ওয়াসেল বিন আতা হাসান বসরীর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। পরে ওয়াসেল বিন আতা, বান্দাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত তাকদীরের আকীদার বিষয়ে মতপার্থক্য করে হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করেন এবং নিজেই মসজিদে আরেকটি শিক্ষা আসর চালু করেন। ওয়াসেল বিন আতা এলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের ওপর খুব বেশী জোর দিতেন। তিনিই মো'তাজেলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বসরার অন্য আরেকটি মসজিদে বসতেন। সেখানকার মজলিসে তিনি ফিকহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব দিতেন এবং ইসলামের জ্ঞান চর্চা করতেন।

আরব কবিরা সেই মসজিদটিকে কবিতা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। কবিতা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে আরবী ভাষার উত্তম চর্চা হয় এবং ভাষার বিভিন্নমুখী বর্ণনা জমা করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখন

একদল লোক আরবী ভাষায় গবেষণা শুরু করেন। এ মসজিদটিই প্রথম আরবী ভাষাবিদ খলীল বিন আহমদ আল-ফারাহিদীর কেন্দ্র ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ভাষার ওপর বই লিখেন। তিনি আরবী কবিতার ছন্দ বিষয়ের ওপর প্রথম বই লিখেছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম নোক্তা ভিত্তিক আরবী পাঠের পদ্ধতি পরিবর্তন করে 'হরকত' ভিত্তিক পাঠ প্রথা চালু করেন। তাঁর 'আল-আইন' প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি সবার কাছে সমাদৃত। এ ছাড়াও তিনি আরবী কবিতার অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন করেন। আরবী ব্যাকরণের পিতা বলে পরিচিত সিবওয়াইহ তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক 'হারীরী' এ মসজিদে আরবী গদ্য ও পদ্যের ওপর কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন।[১]

এ মসজিদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রমাণই যথেষ্ট। সেটা হচ্ছে, হিজরী ৪৫ সালে যিয়াদ ইবনে আবীহ মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি তার সরকারের কঠোর নীতি গ্রহণের উপর জোর দেন যা বসরায় গোলযোগ দমনে সহায়ক হয় এবং সেখানে উমাইয়া শাসন মজবুত হয়।

এখানেই শেষ নয়, ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদও একই নীতি গ্রহণ করেন। তিনি যখন বসরায় হোসাইন ইবনে আলী ও তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীলের প্রতি জনগণের সহানুভূতি লক্ষ্য করেন, তখন ঐ মসজিদের মিম্বার থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে বসরা ও কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। আপনারা কোন মতবিরোধ করবেন না। কেউ মতবিরোধ করলে আমি তাকে ও তার সাহায্যকারীকে হত্যা করবো।

এই জাতীয় কঠোর শাসকদের মাধ্যমে উমাইয়া শাসকরা ইরাকের উপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

বহু আগেই মসজিদটি মিটে গেছে। বর্তমানে এর কোন চিহ্নও নেই।

মসজিদে কুফা

বসরার পর মুসলমানরা ২য় যে শহরের গোড়াপত্তন করেন, তা হচ্ছে কুফা। রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস শহরটি তৈরি করেন। শহরে সর্বপ্রথম জামে মসজিদ তৈরি করা হয়। ১৭ হিজরী সালে

---

১. আল-ইস্পাহানী মোহাদারাতুল ওদাবা- ডঃ আলী আবদুল হালীম।

সা'দ মসজিদের জন্য একখণ্ড চতুর্ভুজ জমি নির্দিষ্ট করেন এবং দেয়ালের পরিবর্তে চারদিকে পরিখা খনন করে মসজিদের সীমানা চিহ্নিত করেন। যাতে করে মানুষ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত এবং পশু মসজিদে প্রবেশ করতে না পারে। মসজিদের পাকা খুঁটির ওপর ছাদ ছিল।

বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা বিন শো'বা (রা) মসজিদটি সম্প্রসারণ করেছিলেন। ৫১ হিজরীতে যিয়াদ বিন আবীহ্‌র আমলে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয়।

ঐ মসজিদ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা) এ মসজিদে বসে লোকদেরকে দীনের শিক্ষা দান করেছেন। এ ছাড়াও তাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ বিন হাবীব আস-সেলমী কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এ মসজিদে ব্যাপক তাফসীর চর্চাও হত। সাঈদ বিন যোবায়ের এবং আলী বিন হামযা আল-কিসাঈ তাফসীর শিক্ষা দিতেন। একই মসজিদে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হত। হযরত আলী এবং আবুল আসওয়াদ আদ্দুওয়াইলী হচ্ছেন এই মসজিদের প্রথম শিক্ষক। বর্ণিত আছে, হযরত আলী আরবী ভাষার ব্যাকরণ তৈরি করেন এবং আবুল আসওয়াদ তা হযরত আলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তখন বহু অনারব ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের আরবী শিখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আরবী ভাষার ব্যাকরণ তৈরি করা জরুরী হয়ে পড়ে।

এ মসজিদে আরবী কবিতা চর্চাসহ এর সমালোচনা হত। কোমাইত বিন যাইদ এবং হাম্মাদ আর রাওইয়াহ ঐ মসজিদে কবিতা চর্চা করেন। অনুরূপভাবে, কবি নাসীব বিন আবি রেবাহও ঐ মসজিদে কবিতা চর্চা করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদের উদ্দেশ্য শুধু দীনী ভূমিকা পালন নয়, বরং এর পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রেও এই মসজিদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

এই মসজিদের রয়েছে বিরাট রাজনৈতিক ভূমিকা, তদানীন্তন সরকারের প্রতিনিধি কিংবা গভর্ণর ঐ মসজিদ থেকে নিজ নিজ সরকারের নীতি ঘোষণা করতেন। ইরাক ও পূর্ববর্তী এলাকার গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসূফ দায়িত্ব লাভ করার পর মসজিদের মিম্বার থেকে নিজ নীতি ঘোষণা করে এক ভাষণ দেন। তিনি যিয়াদ বিন আবীহর অনুরূপ কঠোর নীতি অনুসরণের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বিন আবীহ কুফা ও বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর কূফার জামে মসজিদ থেকে এক ভাষণ দেন।

প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আলী খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর কুফার জামে মসজিদের মিম্বার থেকে এক ভাষণ দেন এবং উমাইয়াদের পরিবর্তে আব্বাসী শাসনের অধিকারের ওপর আলোকপাত করেন। আবুল আব্বাস জ্বরের কারণে বক্তৃতা পরিপূর্ণ করতে না পারায় তার চাচা দাউদ বিন আলী তা সম্পূর্ণ করেন। বক্তৃতায় ১৩২ হিঃ সালে উমাইয়া শাসনের পতনের পর আব্বাসী শাসনের নীতিমালার উপর আলোকপাত করা হয়।

এ ছাড়াও শাসকদের যে কোন ঘোষণা কিংবা আদেশ-নিষেধ জানানোর জন্যও লোকদেরকে মসজিদে আহবান জানানো হত। একবার যিয়াদ বিন আবীহ্‌র একজন ঘোষক এই বলে লোকদেরকে মসজিদে আসার আহবান জানায়, যে মসজিদে না আসবে, তার ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতি, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধে বাতিল হয়ে যাবে।

মসজিদে কুফা এভাবে জ্ঞান ও রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে উমাইয়া আমলে, ইরাক ও কুফাবাসীরা শাসকদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চায় বেশী মনোযোগ দেয়। অপরদিকে, অনারব নূতন মুসলমানগণ নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

এক কথায় বলা যায়, ইসলামের ৪র্থ খলীফা হযরত আলী কুফাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্র বানানোর পর থেকে তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজনীতি, সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল।

মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে মুসলিম বিন আ'কীল বিন আবি তালেবের কবর।

বাগদাদের জামে' মানসুর

২য় আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর মানসুর ১৪৫ হিজরীতে বাগদাদে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজে নূতন শহরের জন্য গোলাকার আকৃতির পরিকল্পনা তৈরি করেন। ফলে, অনেক ঐতিহাসিক শহরটিকে 'গোলাকার শহর' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি শহরের মাঝখানে জামে মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা নেন। তার নামানুসারে মসজিদটিকে 'জামে মানসুর' বলা হয়। রাজধানী শহর বাগদাদ তৈরির সাথে সাথে মসজিদ তৈরির কাজও এগিয়ে চলে। মসজিদটি চতুর্ভুজ। এর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ হচ্ছে, ২শ' গজ।

১৯২ হিজরীতে খলীফা হারুনুর রশিদ মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। এটা বাগদাদের সবচাইতে প্রাচীন মসজিদ।

খতীব বাগদাদী তার 'তারীখু বাগদাদ' বইতে এ মসজিদের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ২৬১ হিজরীতে ২য় আব্বাসী যুগের একজন শাসক মোফলেহ তুর্কী পার্শ্ববর্তী কাত্তান নামক ঘরটিকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে তাকে আরো সম্প্রসারিত করেন। ২৮০ হিজরীতে খলীফা মো'তাদেদ খলীফা মানসুরের প্রাসাদকেও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আব্বাসী শাসনামলে, বাগদাদের জামে' মানসুর মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠে পরিণত হয়।

প্রখ্যাত আরবী ব্যকরণের পণ্ডিত আল্লামা কিসাঈ এ মসজিদে বসে আরবী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আল-ফাররা, আল-আহমার এবং ইবনে সা'দান ছিলেন অন্যতম। আবুল আ'তাহিয়া এ মসজিদে ছাত্রদের সামনে আরবী কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তাদেরকে তা শিক্ষা দিতেন। কথিত আছে যে, আবু আ'মর যাহেদ ৩২৬ হিজরীতে এ মসজিদে নিজ কিতাব 'আল-ইয়াকুত' শিক্ষা দিয়েছেন। এ মসজিদে মিসরের ফাতেমীয় খলীফার পক্ষে বাগদাদের সেনাধ্যক্ষ আল-বাসাসিরী খোতবাহ দিয়েছিলেন।

ফলে মসজিদটি তদানীন্তন সময়ের জন্য জ্ঞান চর্চা এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এর চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই, তবে ইসলামের ইতিহাসে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, ১৪৫ হিজরী থেকে ৭২৭ হিজরী পর্যন্ত মোট ৬শ বছর মুসলমানদের ঐ মসজিদটি বিদ্যমান ছিল।

সিরিয়ার মসজিদ

দামেস্কের উমাইয়া জামে' মসজিদ

উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক হিজরী ৮৮–৯৬ সালে, মোতাবেক (৭০৭–৭১৪খৃঃ) মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিক আনেন এবং তাদের সহযোগিতায় ঐ মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদের জায়গায় আগে মূর্তিপুজারীদের মন্দির ছিল। পরে খৃষ্টানরা সেখানে গীর্জা তৈরি করে। খলীফা ওয়ালিদ খৃষ্টানদের সাথে আলোচনা করে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে সেখানে মসজিদ তৈরি করেন এবং তাদেরকে গীর্জার ক্ষতিপূরণ দান করেন।

ইবনে আসাকের উল্লেখ করেছেন, দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানরা গীর্জার এক অংশে নামায পড়ত এবং বাকী অর্ধেকের মধ্যে খৃষ্টানরা তাদের প্রার্থনা জানাত। পরে খৃষ্টানরা খলীফা ওয়ালিদের আবেদনক্রমে গীর্জার বাকী অংশ মুসলমানদের কাছে হস্তান্তর করতে রাজী হয় এবং খলীফা তাদেরকে শহরের অন্যত্র গীর্জা তৈরির ব্যবস্থা করে দেন। [১]

৬শ' হিজরী সালের শেষ দিকে, ইবনে জোবায়ের তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, 'মসজিদটি খুবই সুন্দর, মজবুত ও উত্তম কারুকার্য সম্পন্ন। খলীফা ওয়ালিদ কনস্ট্যান্টিনোপলে রোম সম্রাটের কাছে তার দেশের ১২ হাজার শ্রমিক চেয়ে পাঠান এবং তাদের সাহায্যে মজবুত ও সুন্দর করে মসজিদ তৈরি করেন। [২]

মসজিদের আঙ্গিনার দৈর্ঘ হচ্ছে, ১৬০মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে ১০০ মিটার। মসজিদের কেবলার দিকের দেয়ালের দৈর্ঘ হচ্ছে, ১৩৬ মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে, ৭৩ মিটার। বিভিন্ন সময়ে মসজিদটির সংস্কার করা হয়েছে। এটি তৈরি করতে ৭ বছর সময় লেগেছিল এবং সেজন্য ৭ বছরের খাজনা ব্যয় করতে হয়েছিল। মসজিদটি ইসলামের কারুকার্যের উত্তম নিদর্শন এবং

---

১. তাহজীবু তারীখি দিমাশক – ১ম খণ্ড
২. রেহালাতু ইবনে জোবায়ের।

ইসলামী শিল্পকার্যের উজ্জ্বল প্রতীক। এতে একটি উঁচু গম্বুজ সহ আরো ৩টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। মসজিদে মোজাইক করা হয়েছে এবং সোনার তৈরি ৬শ শিকল ও রূপার তৈরি বহু শিকল দিয়ে বাতি ঝুলানো হত। এর ফলে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থাভাব দেখা দেয়। ওমর বিন আবদুল আযীয খলীফা হওয়ার পর মসজিদের এ সব ব্যয়বাহুল্য দেখে সোনালী শিকলগুলো খুলে ফেলার চিন্তা শুরু করেন। ঠিক ঐ সময় রোম সম্রাটের দূতেরা মসজিদটি দেখার জন্য দামেস্ক আসে। প্রতিনিধিদল মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে এর শোভা ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন এবং প্রতিনিধি দলের নেতা মাথা অবনত করে তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের ধারণা ছিল, আরব মুসলমানদের শাসনের মেয়াদ বেশীদিন টিকে থাকবে না। কিন্তু এখন আমরা তাদের যে কর্মকুশলতা দেখলাম, তাতে আমাদের বিশ্বাস জাগল যে, তাদের শাসন অবশ্যই সুনির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত পৌছবে।" ওমর বিন আবদুল আযীযের কানে এ কথা পৌছার পর তিনি মসজিদ থেকে সোনালী শিকল প্রত্যাহারের চিন্তা বাতিল করেন এবং বলেন, 'তোমাদের এ মসজিদ কাফেরদের ঈর্ষার কারণ।' [১]

উমাইয়া জামে' মসজিদ ছিল তদানীন্তন মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ইসলামের আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাতে শিক্ষা আসর জমাতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। এতে বিদেশী ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থাও ছিল। মসজিদের বিভিন্ন অংশে ছাত্রদের পৃথক পৃথকভাবে লেখা-পড়ার বিশেষ সুযোগ ছিল।

ইবনে জোবায়ের তাঁর প্রখ্যাত ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন, দৈনিক মসজিদে ফজরের নামাযের পর লোকেরা একত্রিত হয়ে ৭ বার এবং আসরের পরেও ৭ বার কুরআন খতম করতেন।

ইবনে বতুতাও ঐ মসজিদের জ্ঞানচর্চার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মোহাদ্দেসগণ উঁচু চেয়ারে বসে হাদীস শিক্ষা দিতেন। ক্বারীগণ সকাল ও সন্ধ্যায় সুন্দর সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন। মসজিদের প্রত্যেক খুঁটিতে একজন করে শিক্ষক শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। লেখকগণ ছাত্রদেরকে কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ে লেখা শিখাতেন। ইবনে বতুতা আরো বলেন, এই মসজিদে আমি শেখ মোআম্মারের কাছে পূর্ণ বুখারী শরীফ শুনেছি।

এ মসজিদেই ওলামায়ে কেরাম বসে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে ফতোয়া দিতেন। ঐতিহাসিক আল-ওমরী বলেন "মসজিদটি সারাদিন লোকে লোকারণ্য থাকত। কেননা, এটি স্কুল ও বাজারের পথে অবস্থিত ছিল। এতে

---

১. মাসালেকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার - আল-ওমরী- ১ম খণ্ড।

এত আলেম, ফকীহ, ক্বারী, মুফতী ও মোহাদ্দেস ছিল যে, অন্য কোন মসজিদে তা ছিল না। কেউ নামায পড়ছে, কেউ কুরআন পড়ছে, কেউ শিক্ষা দিচ্ছে, কেউ এ'তেকাফ করছে এবং কেউ ওয়ায-নসীহত করছে। দেখা-সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা-বিবৃতির কারণে তা সর্বক্ষণ সরগরম থাকতো।" [১]

ঐ মসজিদে খতীবে বাগদাদীর মত প্রখ্যাত পণ্ডিতও শিক্ষাদান করেছেন। তিনি প্রত্যেক দিন সকালে দারসে হাদীস দিতেন। এ মসজিদেই ইমাম গাযালী (র) তাঁর প্রখ্যাত 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইটি সমাপ্ত করেন।

এ মসজিদ থেকেই খৃষ্টান ক্রুসেডার, তাতার ও সবশেষে সিরিয়ার ওপর ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করা হয়। মসজিদে এ বিষয়ের ওপর আলোচনা এবং খোতবাহ (বক্তৃতা) দেয়া হত। মসজিদের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে নবী হযরত যাকারিয়া (আ)-এর কবর। কাল সিল্ক কাপড় দিয়ে কবরটি ঢাকা। এর ওপরে সাদা অক্ষরে এ আয়াতটি লেখা আছে ঃ

يَازَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نِ اسْمُهُ يَحْيٰى-

এ মসজিদের মিম্বার থেকে বিভিন্ন সরকারী প্রস্তাবাবলী পাঠ করে শুনানো হত এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করা হত।

এ মসজিদে দাঁড়িয়েই আল-এজ্জ্ব বিন আবদুস সালাম ক্রুসেডার ও তাতারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। এখান থেকেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে একসময় যুদ্ধ এবং অন্য সময় যুক্তি-তর্ক পেশ করেন।

মসজিদের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে আজ পর্যন্ত এর রয়েছে বিভিন্নমুখী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও বিবিধ ভূমিকা।

---

১. মাসালেকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার-আল-ওমরী- ১ম খণ্ড।

মিসরের মসজিদ

আ'মর বিন আস জামে' মসজিদ

মিসরের ফোসতাতে এ মসজিদটি অবস্থিত। ২য় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাবের আমলে মিসর বিজয়ী আমর বিন আসের হাতে ফোসতাত শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হিজরী ২১ সালে, তিনি নিজের নামে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটাকে 'মসজিদে আতীক' এবং 'মসজিদে তাজুল জাওয়ামে'ও বলা হয়। এটা মিসরের প্রথম মসজিদ এবং ইসলামের ৪র্থ মসজিদ। এর আগে, মদীনা, কুফা ও বসরায় তিনটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল।

মসজিদটি ছিল খুবই সাদামাটা ধরনের। হযরত আমর বিন আ'স যখন মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেন তখন উপস্থিত ৮০ জন সাহাবায়ে কেরাম কেবলার দিক নির্ধারণে সহযোগিতা করেন। তাদের মধ্যে হযরত যোবায়ের বিন আওয়াম, মেকদাদ বিন আসওয়াদ, ওবাদাহ বিন সামেত, আবুদ্দারদা এবং আবু যার গিফারী (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও কেবলাহ সুস্পষ্ট ছিল এবং তা নির্ধারণে কোন বেগ পাওয়ার কথা নয়। তথাপি তাঁরা সবাই মিলে কেবলাহ নির্ধারণ করেন।

হযরত আমর বিন আ'স (রা) ভেতরে খোলা মেহরাব তৈরি করেননি। উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের আমলে তার প্রতিনিধি কোররাহ বিন শোরাইক মেহরাব নির্মাণ করেন। কেননা, খলীফা ওয়ালিদের গভর্ণর ওমর বিন আবদুল আযীযই সর্বপ্রথম মসজিদের মেহরাবের ধারণা প্রকাশ করেন।

প্রথমে মসজিদের দৈর্ঘ ছিল ৫০ গজ এবং প্রস্থ ৩০ গজ। দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের তৈরি এবং ভিটিতে পাথর। খুঁটি খেজুর গাছের এবং চাল ছিল খেজুর পাতার তৈরি।

সাহাবায়ে কেরামের নিজ হাতে তৈরি ঐ মসজিদে নামায পড়ার সৌভাগ্য কয়জনের আছে?

হযরত আমর বিন আ'স (রা) মসজিদের জন্য একটা মিম্বার তৈরি করেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তা জেনে তাঁর কাছে একটা চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি বলেন, "তোমার ধারণা কি এই যে, তুমি দাঁড়িয়ে খোতবাহ দেবে এবং লোকেরা তোমার পায়ের গোড়ালীর নীচে অবস্থান করবে?" এই চিঠি পেয়ে হযরত আমর বিন আ'স মিম্বারটি ভেঙ্গে ফেলেন। পরে নাওবার বাদশাহ যাকারিয়া বিন মারকিয়া মিসরের আমীর আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহর কাছে মসজিদের জন্য একটা মিম্বার উপহার দেন। ৫৩ হিজরীতে মিসরে নিযুক্ত উমাইয়া গভর্ণর হযরত মোসলেমা বিন মোখাল্লাদ আনসারী (রা) সর্বপ্রথম মসজিদটি পূর্বদিকে সম্প্রসারণ করেন। ৭৯ হিজরীতে আবদুল আযীয বিন মারওয়ান পশ্চিম দিকে মসজিদ বাড়ান। ৯২ হিজরীতে, মিসরে নিযুক্ত উমাইয়া গভর্ণর কোররা বিন শোরাইক মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলেন এবং পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি হযরত আমর বিন আ'স (রা) ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (রা)–এর ঘরের একটা অংশও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ওমর বিন আবদুল আযীয কর্তৃক মদীনার মসজিদের অনুরূপ একটা মেহরাব তৈরি করেন।

২১২ হিজরীতে আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে মিসরের আব্বাসী গভর্ণর আবদুল্লাহ বিন তাহের মসজিদটি আরো সম্প্রসারণ করেন। ফলে, মসজিদের আয়তন অনেক বেড়ে যায়। এটাই ঐ মসজিদের সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ বলে বিবেচনা করা হয়। এরপর আর মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয়নি এবং সে আয়তন আজ পর্যন্তও অব্যাহত আছে। আর তা হচ্ছে, ১১২·৫ x ১২০ মিটার। অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার বর্গমিটার। মসজিদে ৩৭৮টি স্তম্ভ, ৩টি মেহরাব, ১৩টি দরজা ও ৫টি মিনারা আছে।

কারো কারো মতে, মসজিদের ভিটি–মাটি ছাড়া হযরত আমরের মসজিদের আর কোন স্মৃতি অবশিষ্ট নেই।

হিজরী ২১ সালে ফোসতাতে মসজিদ তৈরির পর থেকে আজ পর্যন্ত তা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে এবং এর সেবা শুধু মিসরে নয়, মিসরের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। তখন থেকেই মসজিদটি ইসলামের নীতিমালা, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনক্ষেত্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও তা মিসরের শাসকের বিচারালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

মসজিদে সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রা) শিক্ষাদান শুরু করেন এবং বহু ছাত্র তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষা–লাভ করেন। তিনি অন্য আরেকটি শিক্ষা আসরে ছাত্রদেরকে সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা দিতেন। এ মসজিদে

বসেই তিনি হাদীসের কিতাব 'আস-সাদেকা' এবং অন্য দুইটি কিতাব 'আকদিয়াতুর রসূল' ও 'আশরাতুস সাআহ' রচনা করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা)ই মিসরের সর্বপ্রথম ফকীহ ও শিক্ষক।

শাফেঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেঈ (র) হচ্ছেন ঐ মসজিদের প্রসিদ্ধ শিক্ষক। তিনি ১৯৯ কিংবা ২০১ হিজরীতে মিসর আসেন এবং ফোসতাতের মসজিদে শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি লোকদের কাছে নিজ মাযহাবের মাসআলাসমূহ পেশ করা শুরু করেন। এ দৃষ্টিতে মসজিদটি হচ্ছে শাফেঈ ফিক্হ শাস্ত্রের প্রথম মাদ্রাসা। এ মসজিদেই তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'আল-উম্ম' লিখেন যা শাফেঈ ফিক্হের শ্রেষ্ঠ কিতাব। তিনি প্রত্যেক দিন সকালে ফজরের পর মসজিদে শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে প্রথমে হাদীস, পরে ফিক্হ এবং সর্বশেষে আরবী ভাষা শিক্ষার্থীরা হাযির হত। ইবনে বতুতা বলেছেন, আবু আবদুল্লাহ শাফেঈ মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে বসে শিক্ষা দিতেন। ইমাম শাফেঈ (র) এ মসজিদে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা দান করেন।

এ মসজিদে প্রখ্যাত মোফাস্সের, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ বিন জারীর আত্তাবারীও শিক্ষাদান করেন। তিনি আবুল হাসান বিন সিরাজের আবেদনক্রমে তাফসীর, ফিক্হ, হাদীস, আরবীভাষা ও কবিতা শিক্ষা দেন।

কূফা থেকে কাজী ইসমাইল বিন আল-ইয়াসা' মিসর যান এবং এ মসজিদকে হানাফী মাযহাবের ফিক্হ শিক্ষার কেন্দ্র বানান। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে হানাফী মাযহাব প্রবেশ করান।

শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সাথে মসজিদে ওয়ায ও বক্তৃতার কাজ অব্যাহত থাকে। মিসরের প্রখ্যাত বক্তা লাইস বিন সা'দ এ মসজিদে বক্তৃতা করেন।

মোট কথা, মসজিদে নিয়মিত শিক্ষা আসর বসত। তাতে বহু পাঠকের সমাবেশ ঘটত। দিনে বা রাত্রে ৫ হাজারের বেশী লোক থাকত। মসজিদের আঙ্গিনায় ছাত্র, বিদেশী ও দলীল লেখকসহ বহু লোকের সমাবেশ ঘটত।

মসজিদে শুধু পুরুষদের আসরই নয়, বরং মহিলাদেরও শিক্ষা আসর বসত। মসজিদের এক অংশে নাফীসা বিনতে হাসান বসে শিক্ষা দিতেন এবং সেই অংশে মহিলারা নামায পড়ত। অনুরূপভাবে, ফাতেমা বিনতে আফ্ফান বাগদাদীও সেই অংশে মহিলাদের মধ্যে দীনের দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিতেন।

ফাতেমী শাসনামলে, বিচারক মসজিদে বসে লোকদের বিচার-আচার করতেন। তিনি প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বসতেন।

মসজিদটি বর্তমান যুগের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংক, জ্যামিতি, তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও আরবী ব্যাকরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। তুরস্কের ওসমানী সুলতানদের মিসর শাসনের আগ পর্যন্ত মসজিদটির জ্ঞানসেবা অব্যাহত থাকে। ওসমানী শাসনের পর লোকেরা সেখানে জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দেয় এবং তা শুধু ইবাদাতের কেন্দ্র হিসেবে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

এ মসজিদের ভূমিকা শুধু সাংস্কৃতিক, দীনী ও জ্ঞানসেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাতে রাজনৈতিক তৎপরতাও অব্যাহত ছিল। হযরত আ'মর বিন আস মসজিদকে পরামর্শ সভা হিসেবে ব্যবহার করেন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করতেন। তিনি ঐ মসজিদের মিম্বার থেকে রাজনৈতিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি জনকল্যাণের স্বার্থে কাজ করা, স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং লোকদেরকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে সতর্ক থাকার আহবান জানাতেন।

মসজিদের ভেতর মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বাইতুলমাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কথিত আছে যে, হিজরী ৯৯ সালে উসামা বিন যায়েদ তানূখী প্রথম মসজিদে বাইতুলমাল প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উমাইয়া খলীফা সোলাইমান বিন আবদুল মালেকের পক্ষ থেকে মিসরে খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন।

এ মসজিদটি বিভিন্নমুখী ভূমিকার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

তূলুন জামে' মসজিদ

তূলুন জামে' মসজিদ মিসরের 'আল-কাতায়ে' শহরের আস্কার নামক স্থানে অবস্থিত। এটি বর্তমান কায়রো ও ফোস্‌তাত শহরের মাঝে সাইয়েদা যায়নাব এলাকায় বিদ্যমান। বর্তমানে কায়রো শহর সম্প্রসারিত হয়ে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাই এটি বৃহত্তম কায়রো শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। মিসরে নিযুক্ত আব্বাসী গভর্ণর আহমদ বিন তূলুন আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাসের নির্দেশে ঐ মসজিদ তৈরি করেন। আহমদ বিন তূলুন:২৫৪-২৭২ হিজরী সাল

পর্যন্ত মিসরের গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং আস্কার শহরে অবস্থান করেন। কিন্তু দু' বছর পর আস্কার শহর থেকে মিসরের নূতন রাজধানী কাতায়ে'তে স্থানান্তরিত হন। তিনি নিজে মিসরের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার পর ২৬৩–২৬৫ হিজরীর মধ্যে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

এটি মিসরের ৩য় মসজিদ। এর আগে ২১ হিজরীতে সর্বপ্রথম ফোসতাতে আমর বিন আ'স জামে মসজিদ এবং পরে আস্কারে ১৬৯ হিজরীতে ২য় মসজিদ তৈরি হয়। এটি ৩য় মসজিদ হলেও ডিজাইন ও নকশার দিক থেকে এটি হচ্ছে উন্নত ও প্রাচীন মসজিদ। এর মিনারা হচ্ছে অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী। মিনারাটির বাইরের সিঁড়ির আকৃতি চতুর্ভূজ ও ওপরে ৮ বাহু সম্পন্ন। ওপরে হচ্ছে গম্বুজ। এর উচ্চতা হচ্ছে ৪০ মিটার। মিনারার ভিত্তির দৈর্ঘ উত্তর থেকে দক্ষিণে ১২·৭৫ মিটার এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ১৩·৬৫ মিটার। এটি দেখতে অপূর্ব মনে হয়। মিনারাটি পাথরের তৈরি, কিন্তু মসজিদ ভবন ইঁটের তৈরি। মসজিদটি বৃহদাকার। এর আয়তন হচ্ছে, ২৬ হাজার ২৪৪ বর্গমিটার।

তদানীন্তন সময়ের জন্য মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক বড় ঐ মসজিদ তৈরির পেছনে আহমদ বিন তুলুনের ইচ্ছা ছিল, ফোসতাতে তৈরি আমর বিন আ'স জামে' মসজিদের ভূমিকার মোকাবেলা করা। তাই দেখা যায়, পরবর্তিতে ফোসতাত থেকে ক্বারী, ফকীহ্ ও ছাত্ররা তুলুন জামে' মসজিদে স্থানান্তরিত হয়। কাযী বাক্কার বিন কোতাইবাকে মসজিদের ইমাম, খতীব ও ফিক্‌হের শিক্ষক এবং রবী বিন সোলায়মানকে হাদীসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাদের ভাষণ লেখার জন্য দু'জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

এ মসজিদে চার মাযহাবের ফিক্‌হ, কুরআনের তাফসীর, হাদীস ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা চালু করা হয়। মসজিদের পার্শে ছিল ইয়াতীম খানা। তাতে ইয়াতীম শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া হত।

সুয়ূতী (র) উল্লেখ করেছেন, মসজিদের পিছনে চিকিৎসালয় ও ফার্মেসী খোলা হয়। জুমার দিনসহ অন্যান্য সময়ে আগত মুসল্লীদের জরুরী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাতে ডাক্তার ও ফার্মাসিষ্ট নিয়োগ করা হয়। পরবর্তিতে ঐ অংশটুকু শত শত ছাত্রের চিকিৎসা শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ডাক্তাররা এসে তাতে মূল্যবান বক্তৃতা করতেন।

অনেক লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মসজিদের ঐ সকল সেবা ছাড়াও আহমদ তুলুনের আরেকটি সামরিক লক্ষ্য ছিল। আর তা হল, বাহিরের কোন আক্রমণের সময় তাকে দুর্গম দূর্গ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এটা ছাড়াও মসজিদটি একটি সরকারী ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হত। সেখান থেকে সরকারী ফরমান বা আদেশ জারী করা হত এবং মামলা–মোকদ্দমার বিচার করা হত। তিনি তাতে ঔষধ ও রোগীদের প্রয়োজনীয় পথ্য বা খাবার গুদামজাত করেন। তাই মসজিদটি একাধারে ইবাদাতখানা, আদালত, হাসপাতাল ও দূর্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সাথে সাথে তাকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এখান থেকে সরকারী নীতি ঘোষণা করা হত।

আযহার জামে' মসজিদ

এটা কায়রোর প্রথম শ্রেণীর মসজিদ। ফাতেমী শাসক মোয়ে'য লি–দীনিল্লাহ্ সেনাপতি জাওহার সাকাল্লী ৩৫৯ হিজরীতে মিসর জয় করেন। তিনি মিসরের আখশিদীন শাসকদের উৎখাত করে কায়রো শহর তৈরির পরিকল্পনা নেন এবং একই সময় আযহার জামে' মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৬১ হিজরীর রমযান মাসে, মোতাবেক ৯৭২ খৃঃ, মসজিদ নির্মাণ শেষ হয় এবং ৭ই রমযান প্রথম জুমা আদায় করা হয়।

আযহার নামকরণের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, ফাতেমী শাসকরা শিয়া ইসমাইলী মাযহাবের অনুসারী ছিল। তারা বরকতের জন্য হযরত ফাতেমা যোহরার নামের সাথে মিল রেখে মসজিদের নামকরণ করেন 'আযহার জামে' মসজিদ।

অন্য একদলের মত হল, ফাতেমী শাসকরা মসজিদটিকে একটা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। তাই তারা মসজিদে বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ ও ছাত্রাবাস খোলেন এবং রাষ্ট্রের বাইতুলমাল থেকে তাদের জন্য ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে একটা অংক বরাদ্দ করেন। কিন্তু অন্য একদল ঐতিহাসিক বলেন, মসজিদ তৈরির পেছনে ফাতেমী শাসকদের উপরোল্লিখিত কথিত উদ্দেশ্য যথার্থ নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কায়রোতে একটি সরকারী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা যাতে তাদের প্রচার হয় এবং সার্বভৌমত্বের প্রকাশ ঘটে। সেখানে পরবর্তিতে শিক্ষা চর্চা একটা দৈব ঘটনা হিসেবে সংযোজিত হয়।
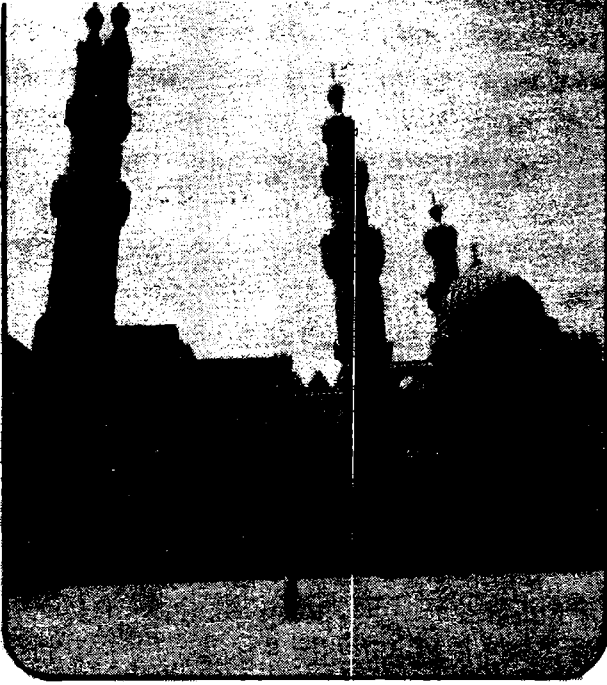
আযহার জামে' মসজিদ

৩৬৫ হিজরীতে, মোয়ে'য লি-দীনিল্লাহর শেষ শাসনামলে, প্রধান বিচারপতি আলী বিন নোমান মসজিদে শিয়া ফিক্‌হের শিক্ষাদান শুরু করেন। আযহার জামে' মসজিদে এটাই প্রথম শিক্ষার আসর। তিনি বড় লোকদেরকে ডেকে শিয়া মাযহাবের দাওয়াত দেন। প্রথমদিকে শিক্ষা আসরে সাধারণ মানুষের প্রবেশের সুযোগ ছিল না।

মসজিদে সর্বপ্রথম শিক্ষাদানের চিন্তা করেন ফাতেমী শাসকের মন্ত্রী আবুল ফারাজ ইয়াকুব বিন ইউসুফ। তিনি ৩৬৯ হিজরীতে মসজিদে শিক্ষা আসর আহবান করেন এবং শিয়া ইসমাইলী মাযহাবের ফিক্‌হ শিক্ষা দেন। তিনি যে কিতাব থেকে শিক্ষা দেন এর নাম হচ্ছে, 'আররেসালাতুল উযিরিয়া'। ঐ মন্ত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। তিনি কোন কোন সময় জামে' আযহারে আরবী সাহিত্যের আসরও বসাতেন।

৩৭৮ হিজরী মোতাবেক, ৯৮৮ খৃঃ মন্ত্রীর ছেলে খলীফা আযীয বিন মোয়ে'যের কাছে একদল ফকীহ নিযুক্ত করার আহবান জানান। খলীফা ৩৭ জন ফকীহ নিযুক্ত করেন এবং তাদের জন্য ভাতা ও হোটেল তৈরী করেন।

জামে' আযহারের শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য এটাই হচ্ছে প্রথম সরকারী নিয়োগ। এই ব্যবস্থার ফলে, জামে' আযহার প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

খলীফা আযীয মিসরের ১০ জন প্রখ্যাত আলেমকে ঐ মসজিদের নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাদেরকে জামে' আযহারের শিক্ষা কার্যক্রম ভালোভাবে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা মসজিদে শরীআহ বা ইসলামী আইনসহ অর্থনীতি এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা সেখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। আযহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জ্ঞানের সেতুবন্ধন হিসেবে বিবেচিত হয় এবং খৃষ্টানদের দূর্গ রোম পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তারা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে পারে। আযহার ইসলামী জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে ৬৫৬ হিজরীতে, চেঙ্গিসখানের উত্তরসূরী হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতনের পর আযহারই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় দুর্যোগ নেমে আসায় ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম পন্ডিত ব্যক্তিরা আযহারে আশ্রয় নেন। খৃষ্টানদের হাতে স্পেনের পতনের পরও সেখানকার ওলামায়ে কেরাম আযহারে আশ্রয় নেন।

জামে' আযহারে চার মাযহাবের ওলামার জন্য পৃথক পৃথক স্তম্ভ ছিল। কেউ কারুর পার্শ্বে বসে শিক্ষা দিতেন না। শিক্ষক ও শিক্ষা আসর নির্বাচনে ছাত্ররা ছিল স্বাধীন।

এ মসজিদে বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত আলেমগণ শিক্ষাদান করেন। তাদের মধ্যে ইবনে খালদুন ছিলেন অন্যতম। তিনি এ মসজিদে বসেই 'আল-এবার' এবং 'মোকাদ্দমা' বই দু'টো রচনা করেন। তিনি মরক্কো থেকে মিসরে স্থায়ী হওয়ার পর বিচারক হিসেবেও কাজ করেন। অনুরূপভাবে, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী, মোকরীজী এবং আবুল আব্বাস কালকাসিন্দীও জামে' আযহারে শিক্ষাদান করেন। আল্লামা মোহাদ্দেস মোকরীও এ মসজিদে হাদীস শিক্ষা দেন। এ ছাড়াও বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা সাখাবীও এ মসজিদে শিক্ষকতার কাজ করেন। এ মসজিদটি পৃথিবীর সেরা ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জামে' আযহার থেকে যে সকল বিখ্যাত শিক্ষার্থী লেখা-পড়া শেষ করে বেরিয়েছেন, তারা হলেন, আল্লামা রেফাআহ তাহতাভী, আলী মোবারক, মুহাম্মাদ আবদুহু, সা'দ যাগলুল, তাহা হোসাইন, মোস্তফা লুতফী মানফালুতী, আহমদ হাসান যাইয়াত ও আলী আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ।

মোকরীজী বলেন, মসজিদে ফেকাহ, হাদীস, তাফসীর, আরবী ব্যাকরণ, ওয়াজ মাহফিল ও যিকিরসহ সকল বিষয়ের অনুশীলন হত। ধনী ও দাতা ব্যক্তিরা মসজিদের শিক্ষার্থীদের জন্য সোনা-রূপা, বিভিন্ন প্রকার খাবার, রুটি ও মিষ্টি উপহার দেন।

বর্তমান যুগের আলোকে আযহারকে মিসরের একটি জাতীয় কিংবা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। বরং এটা ছিল মুসলিম বিশ্বের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আযহার আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠে পরিণত হয়। কিন্তু তুরস্কের ওসমানী শাসনামলে এর জ্ঞানসেবা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। কেননা, ওসমানীরা অনারব হওয়ায় এ বিষয়ের প্রতি তাদের যথার্থ সুনজর ছিল না। কিন্তু ওসমানী শাসনের অবসানের পর পর তা পুনরায় সাবেক পূর্ণ ভূমিকায় ফিরে যায়। দীর্ঘ ১ হাজার বছর যাবত আযহার তার জ্ঞানসেবা অব্যাহত রেখেছে। এ সেবার ফলে, সে মুসলিম বিশ্ব থেকে কুফরী মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা, বাতিল মতাদর্শ, খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা, কাদিয়ানী ও ইহুদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিরাট রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করে।

আযহারের রয়েছে সশ্রদ্ধ ও সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভূমিকা। ১৭ই জুলাই, ১৭৯৮ খৃঃ মোতাবেক ১৭ই মুহররম ১২১৩ হিজরীতে ফরাসী উপনিবেশবাদীরা মিসরের ওপর হামলা করে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার পানি সীমানায় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এর নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। এর ফলে, ১৭৯৮ খৃঃ ২১শে অক্টোবর, কায়রোতে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। এর আগে, ২০শে অক্টোবর, জামে' আযহারে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট বিপ্লবী পরিষদের বৈঠকে পরের দিন বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মসজিদে বৈঠক অনুষ্ঠান এবং তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে, বিপ্লব সম্পর্কে ফরাসীদের আর কোন সন্দেহ সংশয় থাকল না। এই বিপ্লব তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই পরিচালিত হবে। বিপ্লবী পরিষদ ২১শে অক্টোবর সকল দোকান-পাট বন্ধ এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে জাতীয় বিপ্লবী মিছিলে অংশ নেয়ার জন্য জামে' আযহারে আসার আহবান জানায়। পরিষদের মতে, এ মিছিল হবে পরবর্তীতে বিশৃংখলা, গোলযোগ ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই বিপ্লবের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া যাবে। এটাকে 'কায়রোর ১ম বিপ্লব' বলা হয়। বাহ্যত তা নূতন ফরাসী

করারোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও মূলত তা ইসলামী বিশ্বাসের সাথে খৃষ্টান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছিল সুস্পষ্ট বিদ্রোহ।

নেপোলিয়ানের উত্তরসূরী জেনারেল ক্লিপারের বিরুদ্ধে আযহারীরা ২য় দফা যে বিপ্লবের ডাক দেন তাকে '২য় কায়রো বিপ্লব' বলা হয়। শেখ মুহাম্মাদ সাদাতের নেতৃত্বে পরিচালিত শেষোক্ত বিপ্লবের কেন্দ্রও ছিল আযহার। কায়রোর প্রথম বিপ্লবের সময় মসজিদের মিনারাগুলো থেকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলমানদের ঈমান–আকীদা রক্ষার আহবান জানানো হয়। কায়রো শহর ও পার্শ্ববতী গ্রামগুলো দ্রুত ঐ আহবানের প্রতি সাড়া দেয়। তারা কায়রোর রাস্তায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। খোদ নেপোলিয়ানও একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে, আযহারই হচ্ছে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট দূর্গ। যখনই ফরাসী শাসকরা কোন খারাপ আদেশ জারী করেছে, তখনই জামে' আযহারে প্রতিবাদকারীরা একত্রিত হয়ে এর বিরোধিতা করেছে। নেপোলিয়ান আরো লিখেছেন, খৃষ্টান বিশ্বাসের সাথে মুসলমানদের বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেই মিসরে ফরাসী শাসন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, ১৮শ শতাব্দীতে বৃহত্তর ওসমানী খেলাফতের কারণে মিসর একটি শক্তিশালী ইসলামী রাজ্যে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের ঈমান আকীদা মজবুত হয়।

যাই হোক, ২১শে অক্টোবর আযহারের সম্মানিত শিক্ষক ও শেখদের নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিল ১ম দিন ফরাসী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলে। কিন্তু পরের দিন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জামে' আযহার সহ শহরের বাড়ীগুলোর ওপর গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয় এবং তারা জামে' আযহার দখল করে নেয়। বিপ্লবীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তাদের পক্ষে ফরাসী বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি।

ফরাসী বাহিনী শহরে ব্যাপক হত্যা ও লুটপাট শুরু করে এবং জামে' আযহারের ভেতর আশ্রয়গ্রহণকারীদের হত্যা করে। তারা মসজিদে মল–মূত্র ত্যাগ করে এবং কুরআন শরীফকে পদদলিত করে। তারা জামে' আযহারের ভেতর যা কিছু ছিল সব তছনছ করে এবং ধ্বংস করে ফেলে।

আযহারের ওপর ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর আযহারের কয়েকজন বড় আলেম নেপোলিয়ানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং মসজিদের ভেতর থেকে লাশ উদ্ধারসহ তা পরিস্কার করার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু পরে

ফরাসী বাহিনী ১৩ জন আলেমকে গুলী করে হত্যা করে। এরপর রাজনৈতিক কারণে নেপোলিয়ান মিসর ত্যাগ করে এবং জেনারেল ক্লিপারকে তার স্থলাভিষিক্ত করে।

জেনারেল ক্লিপারও নেপোলিয়ানের মত যালেম ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্ব ছিল। একদিন দুপুরে খাওয়া শেষে ফিরে আসার পথে আযহারের একজন ছাত্র ভিক্ষার নামে তাকে ও তার সাথী ইঞ্জিনিয়ার প্রোটানকে হত্যা করে। পরে ফরাসী বাহিনী বাগানে লুকিয়ে থাকা সেই যুবককে আটক করে এবং ক্লিপারের উত্তরসূরী জেনারেল মিনুর নেতৃত্বে সামরিক আদালতে তার বিচার হয়। জামে' আযহারের এই পুরাতন ছাত্র সোলায়মান হেলবী সিরিয়ার অধিবাসী এবং আযহারের ছাত্র। সে লেখা-পড়া শেষে মিসর থেকে সিরিয়া চলে যায় এবং ১৮শ' খৃষ্টাব্দের মে মাসে আবার কায়রো ফিরে এসে পুনরায় আযহারে অবস্থান গ্রহণ করে। সে দীর্ঘ একমাস যাবত আযহারে অবস্থান করে ক্লিপারের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং ১ম কায়রো বিপ্লবের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে। সামরিক আদালত তাকে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তার শরীরের ডান হাত জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে দেয় এবং পরে পেটের ভেতর গরম লোহা ঢুকিয়ে হত্যা করে। তার লাশ পশুকে খাওয়ায়। এভাবে দোষী সাব্যস্ত করে তার আরো চার সাথীকেও করুণ মৃত্যুদণ্ড দান করে।

দ্বিতীয় কায়রো বিপ্লবের পর জামে' আযহারের ওলামায়ে কেরামের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। তাদের সহায়-সম্পত্তি এবং স্ত্রীদের গয়না-অলংকার বিক্রি করে জরিমানার টাকা আদায় করতে বাধ্য করা হয়। ক্লিপারের মৃত্যুর কারণে ওলামাদের ওপর ঐ নির্যাতন নেমে আসে।

সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীরা জামে' আযহারকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। কেননা, ক্লিপারের হত্যাকারী ১মাস ব্যাপী আযহারে অবস্থান করায় তারা এটাকে আযহারেরই ষড়যন্ত্র বলে মনে করে। শেষ পর্যন্ত ফরাসী জেনারেল মিনু আযহার পরিদর্শনে যান এবং মসজিদের ভেতর কোন অস্ত্র আছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি আযহারের ওপর বহু বিধি-নিষেধ আরোপ করে আযহারকে বিরক্ত করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ফরাসী শাসনের বিধি-নিষেধের যাঁতাকলে অতিষ্ঠ হয়ে শেখুল আযহার আবদুল্লাহ শারকাভীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেনারেল মিনুর কাছে গিয়ে জামে' আযহার বন্ধ করে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। জেনারেল অনুমতি দেন। জামে' আযহারের সাড়ে ৮শ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত ১ বছরের জন্য তা বন্ধ রাখা হয়।

১৯ শে সফর ১২১৬ হিজরী মোতাবেক ২রা জুলাই, ১৮০১খৃঃ ফরাসীদের মিসর ত্যাগের আগ পর্যন্ত তা বন্ধ থাকে। জামে' আযহার পুনরায় তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন শুরু করে এবং জ্ঞান, চিন্তা, দর্শন, সামাজিক ও রাজনীতির দিক নির্দেশনা দিতে থাকে। গোটা দুনিয়ার সর্বত্র থেকে ছাত্ররা আযহারে আসে এবং লেখা-পড়া শেষ করে স্বদেশে ফিরে যায়।

পরবর্তীতে মিসরের বিভিন্ন শহরে জামে' আযহারের শাখা-প্রশাখা কায়েম হতে থাকে। বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়া, তান্‌তা, যাকাযীক, মানসুরা, দিমইয়াত এবং আসিউতে এর শাখা কায়েম হয়। বিংশত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোটা মিসরে ২শতেরও বেশী ইনস্টিটিউট কায়েম হয়। এগুলো সবই আযহারের অবদান এবং তার শাখা-প্রশাখা।

১৯৬১ খৃঃ, আযহারকে জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়। এখন তাতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এতে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য, কলা, সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

আযহার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করছে। দীনী এলেম শিক্ষা দিয়ে গোটা দুনিয়ায় জাহেলিয়াতের মোকাবিলা করছে এবং দেশে দেশে আলেম সৃষ্টি করে দাওয়াত ও একামতে দীনের মর্দে মোজাহিদ তৈরি করছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, একটি সাধারণ মসজিদ কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং দেশের জনগণকে বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করে। এছাড়াও তা গোটা দুনিয়ায় ঈমান ও ইসলামের আলো বিতরণ করে যথার্থই ধন্য হয়েছে। ধন্য হে আযহার।

তিউনিশিয়ার মসজিদ

জামে' কায়রাওয়ান

ইসলামী শাসনের সোনালী যুগে বসরা, কুফা ও ফোস্‌তাতের পরে কায়রাওয়ান হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত ৪র্থ শহর। উমাইয়া সেনাপতি আকাবা বিন নাফে' হচ্ছেন ঐ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাগরেব দেশসমূহের অন্যতম বিজয়ী নেতাও বটে। খলীফা মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা) হিজরী ৫০ সালে তাঁকে আফ্রিকার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্র নেতৃত্বে ঐ সকল দেশ জয়ের সময় অংশগ্রহণ করেন। ফলে সে সকল দেশ সম্পর্কে তিনি অপেক্ষাকৃত বেশী অভিজ্ঞ।

আকাবা বিন নাফে' আল-ফেহ্‌রী ১০ হাজার মুসলিম বাহিনী সহকারে তিউনিশিয়া জয় করেন। তিনি সেখানে ইসলামকে স্থায়ী করার চিন্তা করেন। তিনি বলেন ঃ

ইমাম আফ্রিকায় প্রবেশের সাথে সাথে সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং নেতা বা ইমাম চলে গেলে তারা আবার কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। হে মুসলমানগণ! আমি মনে করি তোমরা এখানে একটি শহর কায়েম কর, আমরা সেখানে শিবির স্থাপন করি। যাতে করে ইসলাম এখানে স্থায়ী হয়। তখন তিনি কায়রাওয়ান শহরটি তৈরি করেন। অর্থনীতি, সামরিক কৌশল ও যোগাযোগের গুরুত্বের কারণে তিনি কায়রাওয়ান শহরটি নির্মাণ করেন। উপকূল থেকে দূরে হওয়ায় তা রোমান নৌবহরের নাগালের বাইরে ছিল এবং এর প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থার দরকার ছিল না। সামনে ছিল আওরাস পাহাড়। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করেছে। আকাবা বিন নাফে' শহর প্রতিষ্ঠার আগে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেন। সেই মসজিদ আজও তার প্রতিষ্ঠাতার নামের স্মারক হয়ে আছে।

কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠার ফলে, ইসলামের শৌর্যবীর্য ও বিজয় সামনে অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলে, সাহায্য-সহযোগিতার জন্য মিসরের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায় এবং এ শহরেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে মিসরের সাথে পথের দূরত্ব হ্রাস পায় এবং সময়ের অপচয় থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। কেননা, ইতিপূর্বে মিসরের আদেশ-নিষেধ, অর্থ ও

অন্যান্য সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে উপায় ছিল না। আকাবাসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ মসজিদ থেকেই নিজেদের অগ্রাভিযান, শাসন ও অগ্রগতির অভিযান পরিচালনা করেন। ফলে, পরবর্তীকালে উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ সহ স্পেন বিজয় সম্ভব হয়। আকাবা বিন নাফে' মসজিদের কেবলা নির্ধারণে ব্যাপক পরিশ্রম করেন। জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে মসজিদের কেবলা নির্ধারণ করেন। তিনি মসজিদে একটি মেহরাব তৈরি করেন। এ মসজিদ পরবর্তীতে ঐ সকল দেশসমূহের অন্যান্য মসজিদের দিশারীর ভূমিকা পালন করে।

মসজিদটির দৈর্ঘ ১২৬ মিটার এবং প্রস্থ ৭৭ মিটার। এর সামনের আঙ্গিনার দৈর্ঘ হচ্ছে ৬৭ মিটার এবং প্রস্থ ৫৬ মিটার। মিনারাটি মসজিদের উত্তর বাহুর মাঝামাঝি অবস্থিত। হিজরী ৫০ সালে (৬৭০খৃঃ) যে স্থানে আকাবা বিন নাফে' ঝাণ্ডা দাঁড় করিয়েছিলেন সে স্থানে আজও মেহরাবটি অব্যাহত আছে। ২২১ হিজরী মোতাবেক ৮৩৬ খৃঃ যেয়াদাতুল্লাহ বিন আগলাবের সংস্কারের সময় আকাবার মেহরাবটি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এটিকে ঢেকে দেয়া হয় এবং এর ওপর নূতন মেহরাব নির্মাণ করা হয়। তখন তা ভেঙ্গে নূতন করে নির্মাণের প্রস্তাব করা হলে ফকীহগণ তার বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত এর ওপর দেয়াল নির্মাণ করে তাকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

তিউনেশিয়ার শাসক হাস্সান বিন নো'মান গাস্সানী মেহরাব ছাড়া মসজিদটি ভেঙ্গে তা পুনরায় নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদের জন্য যে মিনারা তৈরি করেন তা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান আছে। মসজিদে মুসল্লী সংকুলান না হওয়ায় হাস্সান তা সম্প্রসারণ করেন। কেননা, কায়রাওয়ান শহরে লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়।

মাগরেবের দেশসমূহের জন্য ঐ মসজিদটিকে জ্ঞানের মিনারা বলা যায়। কেননা, সেখান থেকে ঐ সকল দেশের জন্য বহু আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি তৈরি হন। এর উত্তম সাক্ষী হল, কায়রাওয়ানের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে মরক্কোর ফেজ শহরে 'জামে' কারওইন' প্রতিষ্ঠা করেন। কায়রাওয়ান থেকে বের হওয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে এর সাথে সম্বোধন করে ঐ মসজিদের নামকরণ করেন 'কারওইন'।

কায়রাওয়ান মসজিদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইমাম মালেকের ছাত্র আলী বিন যিয়াদ, আসাদ বিন ফোরাত এবং সাহনূন বিন সাঈদ অন্যতম। আসাদ বিন ফোরাত দীর্ঘ দিন মদীনায় বাস করেন। পরে তিনি মালেকী মাযহাব শিক্ষার জন্য কায়রাওয়ান আসেন। এরপর তিনি হানাফী মাযহাব সম্পর্কে

জানার জন্য ইমাম আবু ইউসুফের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে ইরাক আসেন। অপরদিকে, সাহনুন বিন সাঈদ মদীনা থেকে এলেম শিক্ষা করে কায়রাওয়ানের জামে' মসজিদে শিক্ষকতার কাজ করেন এবং পরে কায়রাওয়ানের ইমাম ও বিচারক নিযুক্ত হন। এই কয়জন হচ্ছেন, কায়রাওয়ান মসজিদের অসংখ্য ছাত্রের মাত্র অল্প কয়েকজন।

কায়রাওয়ানের ওলামায়ে কেরাম দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন। আসাদ বিন ফোরাত সহ অনেক আলেম আকাল্লিয়া দ্বীপ জয়ের পরিকল্পনায় অংশ নেন। আসাদ বিন ফোরাতের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সেই দ্বীপের বহুলাংশ জয় করেন। শেষ পর্যন্ত এক দুর্গ অবরোধকালীন সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। তিনি কায়রাওয়ানের একজন বিচারপতিও ছিলেন।

এ কায়রাওয়ান মসজিদ থেকেই দীনী জ্ঞানের চর্চা, দাওয়াতে দীন ও তাবলীগ, জিহাদ ও ইকামাতে দীনের প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলতে থাকে। এ মসজিদের আলো উত্তর আফ্রিকার সর্বত্র প্রজ্বলিত হয় এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারকে দূর করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠাতা জীবিত না থাকলেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ তাঁর জিহাদী ভূমিকাসহ দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রেখে অন্যান্য মসজিদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে মসজিদটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং জ্ঞানের আলো জোরালোভাবে বিতরণের কাজ অব্যাহত রাখে।

জামে' যাইতুনাহ

বর্তমান তিউনেশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন, মাগরেব দেশসমূহের একজন অন্যতম বিজয়ী হাস্সান বিন নো'মান গাস্সানী। ১২০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত 'জামে' যাইতুনাহ' নামক মসজিদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। আফ্রিকা থেকে রোমান শাসন পূর্ণাঙ্গ খতমের পর যখন পরিস্থিতি তাঁর পুরো নিয়ন্ত্রণে আসে তখন তিনি তিউনেশিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেখানে নিজ শাসনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তারপর তিনি মারসাতে প্রথম যুদ্ধ জাহাজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এর ফলে, আরব মুসলিম বাহিনী আফ্রিকায় উল্লেখযোগ্য নৌশক্তির অধিকারী হয়। ইতিপূর্বে তাদের কায়রাওয়ান ভিত্তিক স্থল শক্তির স্বীকৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

হাস্সান বিন নো'মান গাস্সানী শহর প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শহরের কেন্দ্রস্থলে মসজিদ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা নেন। মসজিদটিকে 'যাইতুন

জামে' মসজিদ' বলার কারণ হল, মসজিদের স্থানে বিশেষ ধরনের যাইতুন বা জলপাই গাছ ছিল। এমনিতেই তিউনেশিয়া যাইতুনের জন্য প্রসিদ্ধ এবং সেখানে রয়েছে যাইতুনের বহু বাগান।

তিউনেশিয়ায় জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে ঐ মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। মাগরেব দেশসমূহের লোকেরা এই মসজিদে এসে জ্ঞান সংগ্রহ করত এবং এখান থেকে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও সাহিত্যিক তৈরি হয়েছেন। দীর্ঘ সাড়ে বারশ শতাব্দী যাবত তা একটানা দীন ও এলেমের আলো বিতরণ করে আসছে অব্যাহতভাবে। ফলে, সেখানে আরবী সাহিত্য, ফিক্হ ও ইসলামী দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে শিক্ষার্থীরা উত্তর ও দক্ষিণ সাহারা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

হিজরী ৭ম তক মোতাবেক খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে হাফসী শাসকেরা জামে' যাইতু[illegible] থেকে লোকদেরকে অন্য দীনী কেন্দ্রের দিকে স্থানান্তর করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। কেননা, যে মসজিদ প্রথম দিন তাকওয়া, পবিত্রতা ও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কোন শাসকের ফুঁৎকারে নিভে যায় না। তাই জামে' যাইতুনাহ থেকে লোকদের দৃষ্টি অন্যত্র ফিরানোও সম্ভব হয়নি। এ মসজিদের উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন, ১. আবু মুহাম্মাদ খালেদ বিন আবি এমরান। তিনি কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর (রা) এবং সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) বিন খাত্তাবের ছাত্র। ২. আবুল হাসান আলী বিন যিয়াদ আল-আবাসী। তিনি মালেক বিন আনাস এবং লাইস বিন সা'দের ছাত্র। ৩. শেখ বাহলুল বিন রাশেদ ৪. আসাদ বিন ফোরাত ৫. ইমাম সাহনুন ৬. আবু মাসউদ আবদুর রহীম বিন আসরাস ৭. আবু খলীল হেশাম বিন খলীল এবং ৮. আবুল বাশার যায়েদ বিন বিশ্র আল-আযদী প্রমুখ।

মসজিদে ছিল এক বিরাট লাইব্রেরী। বিভিন্ন দাতা ব্যক্তিরা ঐ সকল কিতাব ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। মসজিদের ইমাম ছিলেন লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক।

হাফসী শাসনামলে, মসজিদটি ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। তখন সেখান থেকে শিক্ষক, ইমাম, বক্তা, বিচারক, লেখক ও দীনের মোবাল্লেগ তৈরির ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে থাকে। মসজিদে এক ধরনের ওস্তাদ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতেন। অন্য এক ধরনের শিক্ষক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে শিক্ষা দিতেন। বড় শেখ এবং অধিকাংশ ওস্তাদরাই বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। ১৯৩৩ খৃঃ তিউনেশিয়া সরকার এক ফরমান

জারী করে মসজিদটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। তখন থেকে সেখানে আরো ব্যাপক ভিত্তিক জ্ঞান চর্চা শুরু হয়।

ঐ মসজিদের ভূমিকা শুধু জ্ঞান চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ঐ মসজিদ থেকেই তিউনেশিয়ার ওপর ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন সময় সেখান থেকে সত্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলসহ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় এবং গোটা দেশকে প্রতিরোধের পথ দেখায়।

সেই দৃষ্টিতে, তিউনেশিয়াবাসীর অন্তরে 'জামে' যাইতুনার' প্রতি রয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মমত্ব। তাই জামে' যাইতুনাহ একাধারে মাদ্রাসা, মসজিদ, দূর্গ, বিনোদনকেন্দ্র, ঐক্যের প্রতীক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানেও যাইতুনাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হয়।

হাফসী শাসনামলেও যখন জামে' যাইতুনাহ স্বকীয় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে তখন তুরস্কের ওসমানী শাসনামলেও তা স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা করারই কথা। আর এ জন্যই স্পেনীয়রা রাগে-ক্ষোভে মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয় এবং কিতাবপত্রগুলো ঘোড়ার পায়ের নীচে পদদলিত করে।

তাতে কি হয়েছে? জামে' যাইতুনাহ আরো বেশী মর্যাদা সহকারে বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

মরক্কোর মসজিদ

জামে' কারওইন

এ মসজিদটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। মসজিদটির অপর নাম হচ্ছে, জামে' আশ্‌শোরাফা। উত্তর আফ্রিকায় হেলালীদের আক্রমণের ফলে কায়রাওয়ান থেকে যে সকল উদ্বাস্তু ফেজে পালিয়ে আসেন তাদের জন্য ২য় ইদ্রিস ফেজ শহরের পশ্চিমাংশে ঐ মসজিদ তৈরি করেন। মরক্কোর ফেজ শহরকে অধিকতর নিরাপদ মনে করে শরণার্থীরা এখানে এসে আশ্রয় নেন। প্রথম ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ আলাভী ইদ্রিসী শাসনের জন্য ওলাইলে ১ম রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। আর ২য় ইদ্রিস ফেজে ২য় রাজধানী কায়েম করেন। মসজিদটি ১৯২ হিঃ থেকে ২৪৫ হিজরী পর্যন্ত একইভাবে ছোট আকৃতি সহকারে বহাল থাকে।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-ফেহ্‌রী কায়রাওয়ান থেকে মরক্কোতে পালিয়ে আসেন। তিনি ধনী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা ফাতেমা ঐ সম্পদের বিরাট অংশের উত্তরাধিকার লাভ করেন। তিনি ঐ সম্পদের এক অংশ দিয়ে ২৪৫ হিজরী মোতাবেক ৮৫৯ খৃঃ মসজিদটি সম্প্রসারণ করেন।

৫৩৮ হিঃ পর্যন্ত মসজিদে নিয়মিত ফিক্‌হ ও ইসলামী শরীয়াহর শিক্ষা পরিচালিত হত। কায়রাওয়ান থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম শিক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন। কারওইন শব্দটি কায়রাওয়ানের দিকে সম্বোধনসূচক। তারা কায়রাওয়ান থেকে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার নিয়ে এসেছেন এখানে তা বিলির ব্যবস্থা করেন। তখন থেকে মসজিদে মরক্কোর হাযার হাযার লোক শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়েছে। এটি মরক্কোর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মসজিদ যার প্রভাব মরক্কোর ওপর আজ পর্যন্তও বিদ্যমান আছে। মসজিদটি ইউরোপের বহু পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ ১১ শতাব্দী যাবত মসজিদটি মাদ্রাসা, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। কুরআন শিক্ষা, কুরআনের ভাষা আরবী শিক্ষা, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, ফার্মেসী, পদার্থ বিদ্যা, প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করে মসজিদটি মূলত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করে বিরাট অবদান রেখেছে। ছাত্র ও শিক্ষকরা নিজেদের পসন্দের

ব্যাপারে ছিল পূর্ণ স্বাধীন। পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিতও এ মসজিদ থেকে ইসলাম সম্পর্কে লেখা-পড়া করেছেন।

এ মসজিদ থেকেই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে রুশ্দ, ইবনে তোফায়েল, ইবনে বাজাহ, ইবনে হাযাম এবং ইবনুল আরবী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মসজিদে ছিল একটি কোষাগার।

১৯৩১ খৃঃ মসজিদের শিক্ষাকে তিনভাগে বিভক্ত করে একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করা হয়। সেগুলো হল, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। এরপর এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয় এবং তাতে শরীয়াহ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুষদ খোলা হয়।

মরক্কোতে ফরাসী শাসন কায়েম হওয়ার পর তারা মসজিদটিকে খুব ভয় পায়। তারা মসজিদটি বন্ধ কিংবা তাতে ছাত্রের সংখ্যা সীমিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু মরক্কোর বাদশাহ মুহাম্মাদ তা বুঝতে পেরে এর বিরোধিতা করেন এবং মুহাম্মাদ আল-ফাসীকে ১৯৩৭ খৃঃ কারওইন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ আল-ফাসী কারওইনের ছাত্র এবং প্যারিসেও লেখা-পড়া করেছেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষা শিক্ষা এবং মহিলা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মরক্কোকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শাসনের শৃংখলমুক্ত করে। তাই পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক লেখক ও বুদ্ধিজীবী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কলম ধরে। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়টি উন্নতি ও প্রগতির জন্য কাজ করছে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা নেই। ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়া এ সকল মন্তব্য ও বক্তব্যের আর কোন অর্থ নেই। কেননা, আফ্রিকা ও ইউরোপে ইসলাম বিস্তারে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অতুলনীয়।

গোটা আফ্রিকা আজ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোয় আলোকিত। এটি মরক্কোর ইসলাম ও মুসলমানের পুনর্জীবনে অতীতের মত ভবিষ্যতেও বড় ধরনের অবদান রাখবে। -ইনশাআল্লাহ।

স্পেনের মসজিদ

জামে' কর্ডোভা

উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের সেনাপতি মূসা বিন নাসীর হিজরী ৯২ সালে তারেক বিন যিয়াদের ওপর স্পেন বিজয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইতিপূর্বে উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চল মুসলমানদের হাতে এসে যায়। তখনই তারেকের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীকে স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। তারেকের হাতে স্পেন বিজিত হওয়ার পর তা দীর্ঘ ৮শ বছর যাবত মুসলমানদের শাসনাধীন থাকে। ১৭০ হিজরী সাল মোতাবেক ৭৮০ খৃঃ স্পেনের উমাইয়া শাসক আবদুর রহমান আদ-দাখেল কর্ডোভায় 'জামে' কর্ডোভা' বা কর্ডোভা মসজিদ তৈরি করেন। এর দৈর্ঘ ৭৫ মিটার এবং প্রস্থ ৬৫ মিটার। তিনি এটাকে দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের মত করে তৈরি করেন। মসজিদটিকে সম্প্রসারিত করার পর এর সৌন্দর্য অনেক গুণ বেড়ে যায়। কোন কোন ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ এটাকে মধ্যযুগের সবচেয়ে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বিল্ডিং বলে মন্তব্য করেছেন।

মনসুর বিন মুহাম্মাদ বিন আবি আ'মের মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। তিনি তামার পাত দ্বারা মোড়ানো ২১টা দরজা তৈরি করেন। এতে মহিলাদের জন্যও একটা কক্ষ ছিল। মসজিদে মারবেল পাথর লাগানো মোট ১২শ ৩৯টি খুঁটি আছে। মেহরাবের অংশের মোজাইক দেয়ালের ওপর সোনার প্রলেপ দেয়া হয়েছে। পরে মসজিদের প্রস্থ দাঁড়ায় ১২৫ মিটার এবং দৈর্ঘ ১৮০ মিটার। ফলে, মোট আয়তন দাঁড়ায় ২২ হাজার ৫শ বর্গ মিটার। আজও এ আয়তন বহাল আছে। এটি বিশ্বের বড় মসজিদসমূহের একটি, তাতে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, কর্ডোভার জামে' মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নজীরহীন এক উপহার। স্পেনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দীর্ঘদিন পর কর্ডোভা জামে' মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৯২ খৃঃ আবু আবদুল্লাহ সগীর স্পেনের ইসাবেলা ও ফারনান্দোর কাছে পরাজিত হওয়ার পর স্পেন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। সেখানে যদি মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকত তাহলে আজ পর্যন্ত গোটা ইউরোপ ইসলামের পতাকাতলে এসে যেত। কিন্তু স্পেনে মুসলিমদের মধ্যকার বিরোধ এবং পূর্ব আরব অঞ্চলে উমাইয়াদের সাথে আব্বাসীয়দের সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর তারই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে স্পেন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়।

কর্ডোভার জামে' মসজিদ থেকে ইউরোপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা পড়ার উদ্দেশ্যে সেখানে ছুটে আসত। এতে ৩৯০-৩৯৪ হিঃ, পোপ ২য় সলভেস্টারও লেখা-পড়া করেন। তিনি চিকিৎসা ও অংকশাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্যে গোটা স্পেন ঘুরে বেড়ান এবং শেষ পর্যন্ত এ মসজিদে তিনি যে পরিমাণ বিদ্যা শিখেন তাকে যাদুকরী বলা যেতে পারে। এ ছাড়াও পোপ ২য় সলভেষ্টার কারওইন জামে' মসজিদেরও ছাত্র ছিলেন।

একজন প্রাচ্যবিদ বলেছেন, আবদুর রহমান খৃষ্টানদের গীর্জা কিনে একেই জামে' মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন। তার এ বক্তব্য ঠিক নয়। তিনি গীর্জা ভেঙ্গে সে জায়গায় সম্পূর্ণ নতুন মসজিদ তৈরি করেন এবং তাতে মেহরাব, কেবলা ও মিনারা সহ সকল ইসলামী বৈশিষ্ট্য যোগ করেন। ইসলামে মসজিদ গীর্জার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। খৃষ্টানরা গীর্জার পাদ্রীর সহযোগিতায় আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে। পাদ্রী বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু ইসলামে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা অনুপস্থিত। এখানে কেউ কারো মধ্যস্থতাকারী নয়। বরং প্রত্যেককেই আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে।

স্পেনের বহু খৃষ্টান আরবী শিখেছে এবং আরবী ভাষায় সংরক্ষিত ইসলামী সভ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছে। এ ছাড়াও তারা মুসলমানদের কাছ থেকে অন্যান্য জ্ঞানও আহরণ করেছে। ফলে, তারা সেখানে মুসলিম শাসনামলেও বড় বড় চাকুরীতে বহাল ছিল।

কর্ডোভা তখন বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল এবং তা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করেছিল। কিন্তু স্পেনে মুসলিম শাসনের পর সেই অবস্থা আর বিদ্যমান থাকল না। ক্যাথলিক খৃষ্টান শাসকরা মসজিদটি গীর্জায় পরিণত করে। ১৫২৩ খৃঃ মসজিদের কেন্দ্রস্থলে একটি খৃষ্টান উপাসনালয় তৈরি করে। মসজিদের সৌন্দর্য নষ্ট করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সম্রাট ৫ম কার্লস ওরফে শারলিকান এই নির্মাণকাজের নিন্দা করেন। এত কিছু সত্ত্বেও মসজিদটি মুসলমানদের ইবাদাতখানা হিসেবে নিজস্ব সৌন্দর্য ও স্থাপত্য নিয়ে টিকে আছে। মসজিদের শিক্ষা পদ্ধতির ওপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন তদারকী ছিল না। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এর কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরি করতেন।

কর্ডোভার জামে' মসজিদ শুধু জ্ঞানসেবার মধ্যেই সীমিত ছিল না। বরং বিচারক প্রতিদিন মসজিদে বসে লোকদের মামলা-মোকদ্দমার বিচার করতেন। বিচারকের সাথে পেশকার, মুহুরী, উকিল এবং বাদী-বিবাদী একই সাথে উপস্থিত থাকতেন। এ মসজিদের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইরানের মসজিদ

ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন,[১] শিরাজ শহরে এক বিরাট ও প্রশস্ত মসজিদ আছে। এর নাম হচ্ছে, মসজিদে আতীক। মসজিদের আঙ্গিনা বিরাট। বিল্ডিংটি অত্যন্ত সুন্দর। দেয়ালে মারবেল পাথর লাগানো হয়েছে। শহরের নেক ও আলেমগণ তাতে একত্রিত হন এবং মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করেন।

মসজিদে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে ওয়ায করা হয়। এ মসজিদে মহিলা মুসল্লীর সংখ্যা অত্যধিক। শহরের স্ত্রীলোকেরা নেক্‌কার ও ভাল চরিত্রের অধিকারিনী। প্রায় ২ হাযার মহিলা নামাযের জন্য মসজিদে আসেন। ইবনে বতুতা আরো লিখেছেন, তিনি মহিলাদের এত বড় সমাবেশ আর কোন মসজিদে দেখেননি।

ইবনে বতুতা শিরাজ শহরের আরেক মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] মসজিদটি দেখতে খুবই সুন্দর। তাতে বহু কুরআন শরীফ রাখা হয়েছে। তিনি মসজিদের এক কোণে একজন বৃদ্ধ লোককে গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন পড়া অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাঁকে গিয়ে সালাম করেন এবং আলাপ করেন। বৃদ্ধ লোকটি বলেন, "আমি নিজেই মসজিদটি তৈরি করেছি এবং এর জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেছি। এর আয় দিয়ে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আমি আমার জন্য তৈরি কবরের ওপর বসা। এর ওপর কাঠ দিয়ে তাতে বসার ব্যবস্থা করেছি। বিছানা ও কাঠ উঠিয়ে তিনি নিজ কবর তাঁকে দেখান এবং বলেন, এ শহরে আমার মৃত্যু হলে, এখানেই আমাকে দাফন করা হবে। নিকটে একটি বাক্সে কাফনের কাপড় ও কিছু অর্থ রাখা আছে, যেন আমার মৃত্যুর পর হঠাৎ করে দাফনের বিষয়ে কোন সংকট সৃষ্টি না হয়।"

ইবনে বতুতা তাবরীজের ঐতিহাসিক মসজিদের কথাও উল্লেখ করেছেন। ইরানে আরো বহু মসজিদ আছে। কিন্তু আমরা দু'একটি মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করে ইরানের অন্যান্য মসজিদ সম্পর্কে একটি ধারণালাভের চেষ্টা করেছি। অন্যান্য মসজিদগুলোতেও বিভিন্ন রকম কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এলেম চর্চাসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১. রেহলাহ ইবনে বতুতা – ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃঃ।
২. ঐ

তুরস্কের মসজিদ

আমরা এখন তুরস্কের মসজিদগুলো সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করার উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুলের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করব। এর নাম হচ্ছে, আয়াসুফিয়া জামে' মসজিদ। একমাত্র ইস্তাম্বুল শহরেই ৫শ মসজিদ রয়েছে। তুরস্কের প্রায় সকল মসজিদই উত্তম নকশা ও ডিজাইনের স্বাক্ষর। এদ্বারা তুর্কী প্রকৌশলের উন্নতমান প্রমাণিত হয়।

মুহাম্মাদ ফাতেহ খান ৮৫৭ হিঃ মোতাবেক, ১৪৫৩ খৃঃ ইস্তাম্বুল জয় করার পর এ মসজিদটি তৈরি করেন। একশ' প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে ১০ হাজার শ্রমিক দীর্ঘ ১৮ বছর কাজ করার পর মসজিদটি তৈরি হয়। তখনকার দিনে মসজিদের জন্য তুর্কী মুদ্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। মসজিদের দৈর্ঘ ২৭০ ফুট এবং প্রস্থ ২৪৫ ফুট।

মসজিদের রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর গম্বুজ ও খুঁটি। গম্বুজের আয়তন ১১৫ বর্গফুট। মসজিদের মিনারার উচ্চতা হচ্ছে ১৮০ ফুট। মসজিদে ১৭০ টি স্তম্ভ বা খুঁটি আছে। এগুলোতে মার্বেল পাথরসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ লাগানো হয়েছে। মসজিদের ভেতর রয়েছে ঝাড় বাতি। মসজিদের বাঁদিকে রয়েছে, মহিলাদের নামাযের স্থান।

মসজিদের বিরাট ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। অভাবী লোকদেরকে সেই আয় থেকে খাবার দান করা হয়। মসজিদটি প্রথমে ছিল একটি গীর্জা। তারপর তা মুসলমানদের মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৪৫২ খৃঃ পর্যন্ত তা পুনরায় খৃষ্টানদের দখলে ছিল। ১৪৫২ থেকে তুর্কী শাসক মোস্তফা কামালের শাসন পর্যন্ত তা মুসলমানদের মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আতা তুর্ক মোস্তফা কামাল তুর্কী প্রজাতন্ত্র গঠনের সময় তুরস্কের সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ফলে সে আয়াসুফিয়া জামে' মসজিদকে যাদুঘরে রূপান্তরিত করে। এখন পর্যন্তও সেই মসজিদটিকে খুলে দেয়া হয়নি। অথচ সেই মসজিদ থেকে তুরস্কে ইসলামের পয়গাম পৌছানো হয়েছিল।

ভারতের মসজিদ

এখন আমরা ভারতের মসজিদগুলো সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করার উদ্দেশ্যে ২টা ঐতিহাসিক মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করব।
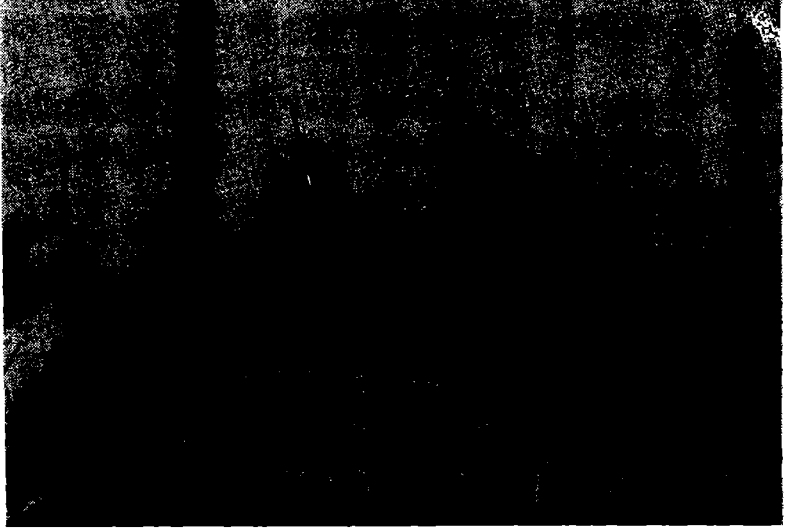
দিল্লী জামে মসজিদ

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে রয়েছে 'দিল্লী জামে' মসজিদ।' মুঘল সম্রাট বাদশাহ শাহজাহান মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১০৬০ হিজরীর ১০ই শাওয়াল মোতাবেক ১৬৫০ খৃঃ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

'ইয়াদগারে দিল্লীর' লেখক বলেছেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন সম্রাট শাহজাহান প্রস্তাব করেন, সেই ব্যক্তি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করবেন, নামাযের জামায়াতে যার ১ম তাকবীরে তাহরীমা কিংবা তাহাজ্জুদ নামায বাদ যায়নি। এ প্রস্তাব শুনে সবাই মাথা নীচু করে বসে আছে। কারুর মুখে কোন জওয়াব নেই। অনেকক্ষণ দেরী হওয়ায় বাদশাহ শাহজাহান বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, এ দুই গুণ আমার মধ্যে আছে। কিন্তু আফসুসের বিষয় যে, আজ এ রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। তারপর তিনি ভিত্তি স্থাপন করেন।[১]

১.তারিখ মাসাজেদ-মুফতী জফীরুদ্দিন, প্রকাশক-মাওলানা সদরুল হাসান কাসেমী, জমু তত্ত, ভারত, প্রকাশকাল-১৯৯০খৃঃ।

ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে দৈনিক ৫ হাজার লোক ৬ বছরে মসজিদটি তৈরি করেন। মসজিদে রয়েছে তিনটি সুন্দর গম্বুজ। মসজিদের দৈর্ঘ ৯০ গজ এবং প্রস্থ ৩০ গজ। ভেতরে ৭টি এবং বাইরে ১২ টি মেহরাব আছে। মসজিদের রয়েছে বিরাট আঙ্গিনা।

১৮৫৭ সালে, ভারতে ইংরেজ শাসন শুরুর পর ইংরেজ সরকার মসজিদটি বন্ধ করে দেয় এবং তাতে নামায ও আযান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, দিল্লীতে খৃষ্টান বিশপের পদ সৃষ্টির পরিকল্পনার মুহূর্তে মসজিদটিকে গীর্জায় রূপান্তর করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৬২ খৃঃ মুসলমানদের বারবার অনুরোধের ভিত্তিতে তা পুনরায় খুলে দেয়া হয়।

মসজিদটির শিল্পকর্ম এত সুন্দর যে, বহিরাগত খৃষ্টান পর্যটকরা তা দেখার জন্য ভেতরে জুতাসহ প্রবেশ করতে থাকে। ১৮৯৯ খৃঃ লর্ড কার্জন ভারতের ইংরেজ শাসক হয়ে আসার পর মুসলমানদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জুতার ওপর মোজা পরে মসজিদে প্রবেশের নির্দেশ জারী হয়। ফলে মসজিদের অবমাননা বন্ধ না হলেও কিছুটা কমে আসে।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাতে ইসলামের ওয়ায-নসীহত ও ইবাদাত অব্যাহত আছে। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দুর্যোগের সময় মসজিদ থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া হয়। আজ পর্যন্তও মসজিদটি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক নির্দেশের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মসজিদের ইমামের নির্দেশে মুসলমানরা হিন্দু শাসিত ভারতে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ ও একক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে।

দারুল উলুম দেওবন্দ জামে'মসজিদ

দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসা ভারতে ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী। তিনি প্রথমে পেয়ারা গাছের নীচে শিক্ষা দান শুরু করেন। পরবর্তীতে তা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। গোটা ভারতের সর্বত্র থেকে সেখানে ছাত্ররা গিয়ে লেখা-পড়া করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল এবং বার্মা থেকেও ছাত্ররা সেখানে লেখা-পড়ার জন্য যায়। অগণিত ছাত্র-শিক্ষকের লেখা-পড়ার জন্য মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার সন্তান হাফেজ মুহাম্মাদ আহমদ ১৩২৮ হিজরীতে, মসজিদটি কায়েম করেন। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা তাতে ইবাদাতসহ ইলেম অর্জন করছে।

মসজিদটি ২ তলা ভবন বিশিষ্ট। পূর্ব থেকে পশ্চিমে মসজিদের দৈর্ঘ ১৮০ ফুট এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রশস্ততা হচ্ছে সাড়ে ৫২ ফুট। ১৩৪৯ হিজরীতে, মসজিদের দোতলা তৈরি করা হয়। এ মসজিদটি মাদ্রাসার ভেতরে এবং তা ছোট। ফলে তাতে মুসল্লীদের সংকুলান হয় না। তাই ১৪০৭ হিজরীতে মাদ্রাসার বাইরের যমীনে আরেকটি বড় মসজিদ তৈরি করা হয়। এটি ৩ তলা বিশিষ্ট মসজিদ। এতে এক সাথে সাড়ে ৭ হাজার মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। মসজিদটির আয়তন হচ্ছে ১১০X১৩০ ফুট।

এলেম ও দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে দেওবন্দ মসজিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মসজিদ

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই লাখ মসজিদ আছে। ঢাকার বাইতুল মোকাররম মসজিদ ছাড়া আর সকল মসজিদই বেসরকারী। জনসাধারণের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ঐ সকল মসজিদ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মসজিদগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিস্তারিত অবস্থা লিপিবদ্ধ না থাকায় সেগুলোর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কেও তেমন একটা জানার সুযোগ নেই। বিশেষ করে মসজিদগুলোর পেছনে সরকারী উদ্যোগ না থাকায় জাতীয় ভিত্তিতে এর রেকর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে না। ফলে, এর ইতিহাসও বিস্তৃতির অতল তলায় ডুবে গেছে ও যাচ্ছে। পক্ষান্তরে বহু মুসলিম দেশে সরকারের ওয়াকফ মন্ত্রণালয় মসজিদগুলোর রেকর্ড সংরক্ষণ করছে এবং সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এত বিরাট সংখ্যক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী কোন উদ্যোগ, যত্ন ও সহযোগিতা না থাকা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। খোদ সরকারী কর্মকর্তারাও যখন মসজিদের মুসল্লী তখন মসজিদের যত্নের ব্যাপারে তাদের অবহেলাও কম আশ্চর্যের বিষয় নয়।

এখন আমরা নমুনা হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এগুলোর মাধ্যমে বাকীগুলোর অবস্থা আন্দাজ করা যাবে। কেননা, বাংলাদেশের সকল মসজিদের ভূমিকা প্রায় একই রকম। তাই সকল মসজিদ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

শাহজালাল মসজিদ

সিলেট শহরে দরগাহ মসজিদ নামে শাহ জালাল মসজিদটি অবস্থিত। এটি শহরের বড় মসজিদ এবং তাতে বহু লোক নামায আদায় করে। দূর দূরান্ত থেকেও অগণিত লোক এ মসজিদে আসে। যদিও বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং জেরুসালেমের মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যারা দূর থেকে শুধু মসজিদ যেয়ারতের জন্য আসেন তারা হাদীসের বিরোধিতা করেন। আর যারা কবর যেয়ারতের জন্য আসেন তাদের ব্যাপারেও সমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর।

মসজিদের উত্তর পার্শ্বেই রয়েছে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা শাহজালাল (রঃ) এর কবর। তিনি এ মসজিদে বসে দীনের শিক্ষাদান করেন এবং লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ করেন। ঐ অঞ্চলে এ মসজিদ ছাড়া ইসলামী শিক্ষার অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। মসজিদটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে বিষয়টি বুঝার জন্য তাঁর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

শাহজালাল (র) ১২৭১ খৃঃ তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি ১২৪৪ খৃঃ ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন এবং যৌবনে পদার্পণ করে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর মামা একজন আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন। মামার নির্দেশে তিনি ভারতে ইসলাম প্রচারের কঠিন সংগ্রামে আসেন। তখন গোটা ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। তিনি সাথে ৩৬০ জন শিষ্য বা সাথী নিয়ে আগমন করেন। তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। সুলতান তাদেরকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানান। শাহজালাল (র) নিজ শিষ্যদেরকে নিয়ে সিলেটে ইসলাম প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁরা সিলেট পৌছেন।

গৌর গোবিন্দ নামক একজন হিন্দু রাজা সিলেট শাসন করত। তিনি তাঁদেরকে সেখানে ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়। গৌর গোবিন্দ স্থানীয় মুসলমানদের ওপর খুব বেশী নির্যাতন করত। সে বোরহানুদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান কর্তৃক গরু জবেহর অপরাধে তার ছোট শিশুকে টুকরা টুকরা করে হত্যা করে। বোরহানুদ্দীন দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের কাছে উপস্থিত হন এবং অত্যাচারের প্রতিকার কামনা করেন। ফিরোজ শাহ আপন ভাগিনা সিকান্দার খান গাজীকে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠান। সিকান্দার খান দুইবার যুদ্ধে গৌর গোবিন্দের সাথে পরাজিত হন। ঠিক ঐ সময় শাহজালাল (র) বাংলায় আসেন এবং উপরোক্ত নির্যাতনের প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে এবার গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয় ও সিলেট ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এভাবে ১৩০৩ খৃঃ সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি ১৩৪৬ খৃঃ ইন্তেকাল করেন এবং মসজিদের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর শিষ্যরা এতদাঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ ও জিহাদে অংশ নেন এবং তাদের প্রচেষ্টায় ঐ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে।

১৩৪৬ খৃঃ মরক্কোর প্রখ্যাত বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা সিলেট সফরে আসেন এবং শাহজালাল (র) -এর সাথে সাক্ষাত করেন।

দুঃখের বিষয় আজ কি শাহজালাল মসজিদ তার সাবেক ভূমিকা পালন করছে, না সেখানে সে ভূমিকার বিপরীত ও উল্টো কাজ চলছে? সেখানে আজ তাঁর কবরে সেজদাহ চলছে, ওরস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সামনের ছোট কূয়ায় গজার মাছ পালন করে বিভিন্ন নিয়ত ও মকসুদ পূরণের উদ্দেশ্যে খাবার দেয়া হচ্ছে এবং সেগুলো মানুষকে খেতে দেয়া হয় না। বরং এগুলোর মৃত্যুর পর কাফন দিয়ে দাফন করা হচ্ছে। সাধারণ কবুতরকে জালালী কবুতর নামকরণ করে সেগুলোর খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কবরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা চলছে। আরো চলছে কতকিছু।

এখন প্রশ্ন হল, ইসলাম কি এগুলো অনুমোদন করে? শাহজালাল (র) কি এ সকল বেদআত ও কুসংস্কারের দাওয়াত দিয়েছিলেন? আজ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে সামনে রেখে এবং শাহজালাল (রহ)-এর সংগ্রামী ও জিহাদী জিন্দেগীর আলোকে তাঁর মসজিদ ও কবর থেকে ঐ সকল অনাচার বন্ধ করতে হবে। এটা সরকারসহ সকল আলেম ও দেশবাসীর কর্তব্য। নচেত, এ সকল মন্দ ও অনৈসলামী কাজের মাধ্যমে শাহজালালের প্রতিষ্ঠিত হেদায়াতের কেন্দ্রে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার এ সয়লাব রোধ করা যাবে না। কতলোক গোমরাহ হচ্ছে ও কত গুনাহ অর্জন করছে, তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই।

সোনার গাঁর মসজিদ

আজ থেকে ৬শ বছর আগে সোনার গাঁ ছিল বাংলার রাজধানী। সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ছিলেন বাংলার সুলতান। সোনার গাঁ ছিল একটি কৌশলগত স্থান। এর চারদিক নদী পরিবেষ্টিত। তাই শত্রুদের আক্রমণের কবল থেকে তা ছিল নিরাপদ। নদীগুলো হচ্ছে, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ইছামতি ও শীতলক্ষ্যা। দ্বীপটির দৈর্ঘ ৬৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৩২ কিলোমিটার। বর্তমান ঢাকা শহর থেকে পূর্বদিকে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে মাত্র ২৪ কিলোমিটার দূরে।

পরবর্তীতে, সুলতান হোসেন শাহ সোনার গাঁয়ে এক সুদৃশ্য মসজিদ তৈরি করেন। মেহরাব কাল পাথর দিয়ে তৈরি এবং তাতে উত্তম কারুকাজ রয়েছে। মসজিদের স্তম্ভগুলো বেলে পাথর দিয়ে গড়া। রাজধানী শহর তৈরির পর স্বভাবতই সেখানে একটি বড় মসজিদ তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ওলামায়ে কেরাম সেখানে ইসলাম প্রচার করেছেন ও লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। সেখানে পঞ্চ সাধকের কবর আজও সে স্মৃতি বহন করছে।

অন্যান্য মসজিদ

মুঘল আমলে বাংলায় অনেক মসজিদ তৈরি হয়েছে। শাহ্ শুজা এবং সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকা শহরে অনেক মসজিদ তৈরি হয়। শাহশুজা বড় কাটরা এবং শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় ছোট কাটরা, চক বাজার জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর সাত গম্বুজ মসজিদ এবং বিবি পরি ও বিবি চম্পা মসজিদ তৈরি করেন। কুমিল্লা শহরের শাহ শুজা মসজিদও একই কথার সাক্ষী।
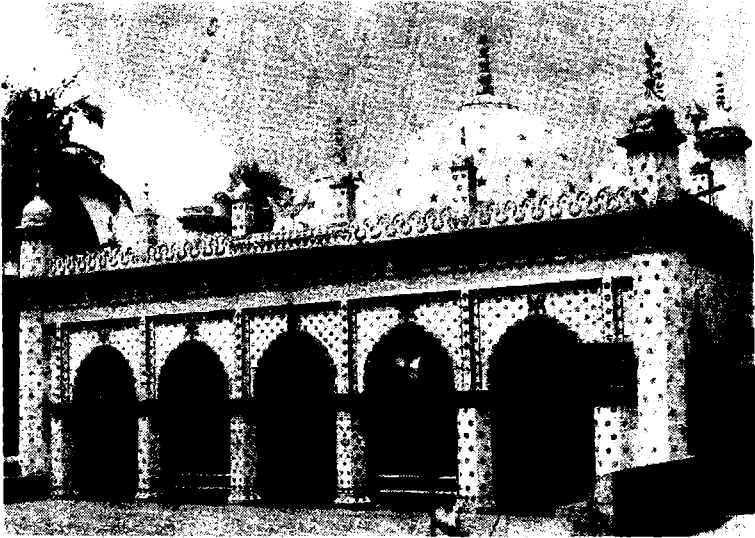
তারা মসজিদ

দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে বিভিন্ন সময় বহু মসজিদ তৈরি হয়েছে। চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লা শাহী মসজিদ, রাজশাহীর শাহ মাখদুম মসজিদ ও ঢাকার তারা মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও প্রত্যেক জেলা শহরে এক একটি বড় মসজিদ আছে। দেশের শহর ও গ্রামে বহু মসজিদ আছে। সেগুলোতে নিয়মিত নামায ছাড়াও কুরআন শিক্ষা এবং ওয়ায-নসীহতের ধারা চালু আছে।

বায়তুল মোকাররম মসজিদ

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। ঢাকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আইউব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন গোলাম ফারুক। ঢাকা শহর বলতে পুরাতন ঢাকাকেই বুঝাত। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শহর সম্প্রসারিত হওয়ায় চকবাজার জামে মসজিদ কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে অক্ষম ছিল। তাই ঢাকায় একটি বড় মসজিদ তৈরির প্রয়োজন অনুভূত হয়।
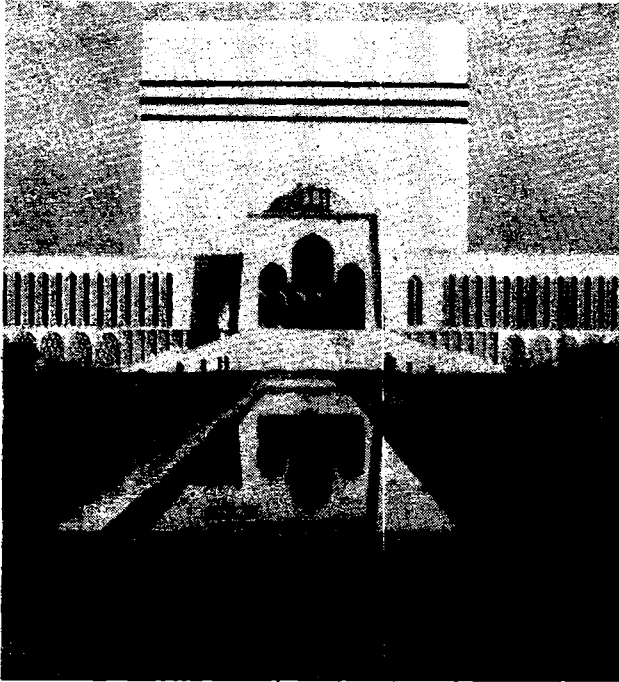
বায়তুল মোকাররম জামে' মসজিদ

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, মুফতী দীন মোহাম্মদ ও মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ জাতীয় মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তাঁরা গভর্ণর গোলাম ফারুকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছে মসজিদের জন্য সরকারী জমি বরাদ্দের দাবী জানান। গভর্ণর রাজী হন। বায়তুল মোকাররমের বর্তমান স্থানটি ছিল সরকারের খাস জমি। গভর্ণর তা মসজিদের জন্য বরাদ্দ করেন। মসজিদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সহ সার্বিক ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পপতি

ইয়াহইয়া বাওয়ানী। বাওয়ানীসহ অন্যান্যদের আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালে সরকারী জায়গায় বেসরকারী কেন্দ্রীয় মসজিদ তৈরি হয়। একটি কমিটি মসজিদ পরিচালনা করত।

১৯৭১ সালে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মসজিদটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয় এবং বর্তমানে এটি বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী ও বৃহত্তম মসজিদ। ইসলামী ফাউণ্ডেশন মসজিদের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিচ্ছে। মসজিদটি ৭ তলা। নীচের তলা ও দোতলার পশ্চিমাংশে রয়েছে শপিং সেন্টার। মসজিদের গা ঘেঁষেই সরকারী সংস্থা ইসলামী ফাউণ্ডেশনের ভবন রয়েছে।

দোতলা থেকে মসজিদ শুরু। পূর্ব-দক্ষিণ ও পূর্ব-উত্তর কোণে রয়েছে বিরাট অজুখানা। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের অজুখানার ওপর মহিলাদের পৃথক নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের ওঠা-নামার সিঁড়িও পুরুষদের থেকে আলাদা। মসজিদের ১ম তলার ভেতরের দেয়াল ও স্তম্ভের কিছু অংশে সুন্দর মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে। মসজিদের বাইরের দেয়ালের উপরিভাগে কা'বা শরীফের গেলাফের বেল্ট এর অনুরূপ বেল্ট অংকিত আছে এবং কা'বার আকৃতিতে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। মসজিদে এক সাথে প্রায় ১ লাখ লোক নামায পড়তে পারে। মসজিদে বিভিন্ন ইসলামী দিবস উপলক্ষে ওয়ায-নসীহতের ব্যবস্থা করা হয়।

মসজিদের ঐতিহাসিক ভূমিকার সার-সংক্ষেপ

আমরা মুসলিম বিশ্বের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মসজিদগুলোর যে ভূমিকা ও অবদান আলোচনা করলাম তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. মসজিদ ইবাদাতের স্থান। ২. ওয়াজ-নসীহতের স্থান। ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৪. ভাল আচরণ শিক্ষা কেন্দ্র। ৫. নেতৃত্ব সৃষ্টির কেন্দ্র। ৬. ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সূতিকাগার বা উৎস স্থান। ৭. ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মৌলিক ও প্রাথমিক কেন্দ্র। ৮. সেনাবাহিনীর সমাবেশ ও যুদ্ধে রওনা হওয়ার স্থান। ৯. নামাযের মাধ্যমে সর্বোত্তম সাম্য কেন্দ্র। ১০. বুদ্ধি বৃত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১১. আদালত বা কোর্ট। ১২. বিদেশী দূত গ্রহণকেন্দ্র। ১৩. সামরিক নেতৃত্ব সৃষ্টির কেন্দ্র। ১৪. সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৫. সামাজিক নিরাপত্তা কেন্দ্র। ১৬. প্রেসিডেন্ট ভবন। এখান থেকে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও সরকার প্রধানের নামে অফিসিয়াল চিঠি পাঠানো হত। ১৭. অহী লেখার কেন্দ্র। ১৮. সচিবালয়। এখান থেকে বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করা হত। ১৯. রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ঘোষণা কেন্দ্র। ২০. হাসপাতাল, বিশেষ করে সামরিক হাসপাতাল। ২১. ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কার কেন্দ্র। ২২. দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র। ২৩. দীনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ২৪. মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার উৎস স্থান। ২৫. পারস্পরিক সহযোগিতার স্থান। ২৬. ইসলামের পুনর্জাগরণ কেন্দ্র। ২৭. পরামর্শ কেন্দ্র। ২৮. কল্যাণ কেন্দ্র- প্রতিদিন 'হাইয়া, আলাল ফালাহ' এই আওয়াযের মাধ্যমে কল্যাণের দিকে ছুটে আসার আহবান জানানো হয়। ২৯. বিজয়কেন্দ্র। ৩০. রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল বা কোষাগার। ৩১. দৈনিক মিটিং এর স্থান। ৩২. দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদের কেন্দ্র।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম যুগের মসজিদগুলোতেই উপরোল্লিখিত ভূমিকা বাস্তবায়িত হয়েছে। সেগুলোই আমাদের অনুসরণযোগ্য। পক্ষান্তরে, পরবর্তী যুগের মসজিদগুলোর ভূমিকা ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। সেগুলো নামায, কুরআন পাঠ ও কিছু ওয়াজ-নসীহত ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করছে না।

মসজিদের ইমাম নির্ধারণ

এখন আমরা একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে, মসজিদের ইমাম নির্ধারণ প্রসঙ্গ। কেননা, মসজিদের জন্য ইমাম অত্যাবশ্যক। ইমাম ছাড়া কোন মসজিদ চলতে পারে না। তিনি হলেন মসজিদের নেতা।

ইসলামী সমাজে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ও নেক আমলের অধিকারী হবেন। অন্যদের চাইতে তাদের ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও এহসানের মানও হবে উন্নতমানের। সরকার প্রধান নিজে কিংবা তার প্রতিনিধিই মসজিদের ইমাম হবেন এবং নামাযসহ মসজিদের অন্যান্য সকল কাজের ইমামতি করবেন। তারা মুসল্লী সাধারণকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। তাই তাদেরকে হতে হবে মডেল বা আদর্শ। তাদের চরিত্র, কথা ও কাজে কোন অসামঞ্জস্য থাকবে না এবং তারা হবেন সকল বিষয়ে আন্তরিক। অন্য কথায় ইমামত হচ্ছে নেতৃত্ব। মুসলমানের নেতৃত্ব এক ও একক। তাই যিনি রাষ্ট্রের নেতা, তিনি মসজিদেরও নেতা এবং তার প্রতিনিধিরা তারই নীতি অনুসরণ করেন বলে তাদের মাধ্যমে একই নেতৃত্ব বর্তমান থাকে। ইসলাম সমাজ, রাষ্ট্র ও মসজিদের নেতৃত্বকে একই জিনিস মনে করে। রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন একাধারে আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের নেতা। তিনি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার কারণে মসজিদে নববীরও ইমাম ছিলেন। অন্য কাউকে ইমাম বানাননি। একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)। তাঁরা একদিকে ছিলেন খলীফা, আর অন্যদিকে ছিলেন মসজিদের ইমাম। মুসলমানের নেতার প্রধান মাপকাঠি সম্পর্কে কুরআন বলছে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী।" তাকওয়া হল, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার নাম। যিনি সর্বাধিক আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানেন তিনিই ইমামতি ও নেতৃত্বের যোগ্য। আর যাদের মধ্যে এ গুণের অভাব রয়েছে তারা নেতৃত্বের উপযুক্ত নয়।

কিন্তু যে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে কায়েম নেই এবং যেখানে ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত নেই সে দেশের রাষ্ট্র

ও সরকার প্রধান এবং তার প্রতিনিধিদের দ্বারা মুসলমানের সঠিক নেতৃত্ব আঞ্জাম পেতে পারে না। তারা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদে বিশ্বাসী হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। শুধু তাই নয় বরং ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ও ভুল ধারণার শেষ নেই। তারা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা, ধর্মনিরপেক্ষতার কূপমণ্ডুকতা, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের গোলক ধাঁধাঁ এবং পুঁজিবাদসহ অন্যান্য মানব রচিত মতবাদের মরিচিকার পেছনে দৌড়ে পেরেশান। ইসলাম সম্পর্কে তাদের চিন্তা-ভাবনা ও জানা-শুনার সুযোগ নেই। তাই মসজিদে তাদের ইমামত চলতে পারে না। ইমামতি তো দূরে থাক, তারা খুব কমই নামায পড়েন কিংবা মসজিদে যান। এমতাবস্থায় বিকল্প ইমাম ছাড়া কোন উপায় নেই। বর্তমান যুগের মুসলিম সমাজ ও মসজিদগুলোর বাস্তব চিত্র তাই। তাই সমাজের ইসলাম দরদী মুসলমানদেরকেই নিজেদের মধ্য থেকে ইমাম নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

এবার আমরা ঐ বিকল্প ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।

মসজিদ তার ভূমিকা পালন ও যথার্থ অবদান রাখতে পারবে কি না তা নির্ভর করে মসজিদের ইমামের ওপর। ইমাম যোগ্য ও দক্ষ হলে এবং বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ হলে মসজিদ তার মৌলিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যদি দুর্বল, অদক্ষ, বেশী সহজ-সরল ও কম জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং পর্যাপ্ত চালাক-চতুর না হয়, তাহলে মসজিদ ইবাদাতখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং সে তার আসল ও মৌলিক পয়গাম পৌঁছাতে ব্যর্থ হবে। যে পাড়া বা মহল্লায় মসজিদ আছে, কমপক্ষে সেই পাড়া বা মহল্লার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে ইমামতির যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা দরকার। যদি আরো বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, আরো ভাল। কিন্তু পাড়া বা মহল্লার লোকদের চাইতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি ইমাম না হলে, তিনি তাদেরকে কিছু দিতে পারবেন না। দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে দেবেন কিভাবে? অনুরূপভাবে, বড় মসজিদ বা কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমামকেও দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের অন্যতম হতে হবে।

মক্কার মসজিদ সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

এখন আমরা ইমাম নির্বাচনসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ১৫-১৮ই রমযান, ১৩৯৫হিঃ মোতাবেক ২০-২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খৃঃ পবিত্র মক্কা মোকাররামার রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত। 'মসজিদের ভূমিকা ও পয়গাম' শীর্ষক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাবলী উল্লেখ করবো।

প্রথম

১. ইমামকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের অধিকারী, অনেকের জন্য উদাহরণ, সৎকাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী এবং সত্যের বাণী প্রকাশে সক্ষম হতে হবে।

২. সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে, লোক দেখানোর মনোভাব দূর করতে হবে, মানুষের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে সীমালংঘন করতে পারবে না এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। (এখানে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে)।

৩. কুরআন ও হাদীসের সাথে সর্বদা সম্পর্ক রাখতে হবে এবং তা গভীর অধ্যয়ন করতে হবে ও প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করতে হবে।

৪. সূক্ষ্ম বুঝ-জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, ব্যাপক লেখা-পড়া করা, যে সমাজে বাস করে সে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া এবং সেই সমাজের অন্যান্য মতাদর্শ, দর্শন, চিন্তাধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে।

৫. ইসলামের ইতিহাস এবং মানব সভ্যতার ইতিহাস জানতে হবে। এ ছাড়াও প্রাণী জগত এবং বিশ্ব সম্পর্কেও জানতে হবে।

৬. আরবী ভাষায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে। ইংরেজী সহ আরো ২/১ টা বিদেশী ভাষা জানা থাকলে ইসলামের দুশমনরা কি বলে তা বুঝে এর মোকাবিলা করতে পারবে।

৭. পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান থাকতে হবে যেন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামকে তুলে ধরা সম্ভব হয়। এর মধ্যে নামাযের মাসলা-মাসায়েলও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৮. উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আচরণের অধিকারী হতে হবে। যাতে করে লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন এবং তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

৯. যথেষ্ট ধৈর্য ও সহ্যশক্তি থাকতে হবে যেন মসজিদের পাড়া বা মহল্লার লোকদেরকে ইসলামী জ্ঞান দান করতে পারে।

১০. লোকের কাছে স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সে জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে হবে। তাতে করে লোকেরা তাকে সম্মান করবে ও ভালবাসবে এবং তাকে অপমান করার সাহস পাবে না।

১১. তাজবীদ সহকারে সুন্দর ও উত্তম কুরআন তেলাওয়াত জানতে হবে।

১২. সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরতে হবে যা মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

দ্বিতীয়

মসজিদ সম্মেলন ইমাম তৈরির জন্য যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেগুলো হচ্ছে :

১. ইমাম ও দাঈ' ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইমামের বিভিন্নমুখী কর্তব্য সম্পর্কে গবেষণা করা এবং এ সম্পর্কে পত্রিকা প্রকাশ করা।

৩. আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করে ইমামদের মুখ থেকে তাঁরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন। সেসব সমস্যা জানার চেষ্টা করা ও সেগুলোর সমাধানে সাহায্য করা। এ ছাড়াও তাদের জ্ঞান ও তৎপরতা বৃদ্ধির উপায় নির্দেশ করা।

৪. ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে একটি উঁচু তদারক কমিটি গঠন করা।

৫. ইমামদেরকে দাওয়াতে দীনের নিত্য-নতুন মাধ্যম ও সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে অবহিত করা।

তৃতীয়

মসজিদ সম্মেলন জুম'আর খোতবা প্রসঙ্গে যে সকল সুপারিশ করেছে সেগুলো হচ্ছে :

১. (ক) পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং

আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মোনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহত করা।

(খ) লোকদেরকে কুরআন ও হাদীস থেকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা এবং কুসংস্কার ও বেদআত থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়া।

(গ) ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা করা। পাশাপাশি ভ্রান্ত মতবাদ ও দর্শন থেকে দূরে থাকার বিষয়ে উপদেশ দেয়া এবং যুক্তি ও দলীল দিয়ে সেগুলোর ভ্রান্তি ও দুর্বলতা তুলে ধরে সেগুলোর ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা। যেন মানুষ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের ওপর টিকে থাকে।

(ঘ) সমাজের চলমান সমস্যা ও সংকট আলোচনা করে ইসলামের দৃষ্টিতে সেগুলোর সমাধান পেশ করা। মহিলা ও পরিবারের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলাম বিরোধী মহলের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারণা ও আত্মঘাতী তৎপরতা বিদ্যমান আছে।

(ঙ) ইসলামের বিভিন্ন উপলক্ষ ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা। যেমন, বছরে একবার করে ঘুরে আসে রমযান, হজ্জ, হিজরত, আশুরা, মে'রাজ ইত্যাদি। মুসল্লীরা যেন সে সকল বিষয়ে জানার জন্য আরো বেশী আগ্রহী হয়।

(চ) ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। সাথে সাথে আঞ্চলিকতাবাদী ধর্মীয় ও বর্ণবাদী সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধেও কথা বলতে হবে। এ ছাড়াও মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কেও আলোকপাত করতে হবে। যাতে করে মুসলমানরা তাদের অন্য জায়গার সমস্যাগ্রস্ত ভাইদের ব্যাপারে চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন না থাকে। কেননা, হাদীসে এসেছে, "যে মুসলমানের সমস্যার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে না, সে মুসলমান নয়।"

(ছ) মুসলমানের অন্তরে জিহাদ ও শক্তির প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে, মুসলমানের পবিত্রস্থান ও ভূমির হেফাজতের বিষয়ে জযবা সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমানের ইয্যত-সম্মান, আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী শরীয়াহর প্রতিরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে দাওয়াতে দীনের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে।

২. কোন ব্যক্তি, দল বা প্রশাসনের প্রচারণার উদ্দেশ্য থেকে খোতবাকে মুক্ত রাখতে হবে এবং তাকে একমাত্র আল্লাহ ও দীন এবং দাওয়াত ও

আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"এবং মসজিদসমূহ শুধু আল্লাহর জন্য, তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।"

৩. সরকারী প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইমামের ওপর কোন খোতবা চাপিয়ে দেয়া যাবে না যাতে কেবল আত্মাবিহীন দেহের মুখের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ইমামকে নিজ বুদ্ধি, যোগ্যতা ও চিন্তা অনুযায়ী খোতবার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে দেয়া উচিত।

৪. ওলামায়ে কেরাম এবং দায়ী'দের উচিত উন্নতমানের ইসলামী খোতবাহর নমুনা তৈরি করা। সেগুলোতে কুরআন, হাদীস, ইসলামী ইতিহাস, নেক লোকদের বক্তব্য এবং ভাল ও ইসলামী কবিতার সাহায্য নিতে হবে। এতে করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইমামরা তা দেখে ভাল খোতবাহ তৈরি করতে পারবেন।

৫. খোতবায় ইসলামের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজীর সাহায্য নেয়া উচিত। দুর্বল ও মিথ্যা হাদীস, মিথ্যা কাহিনীসহ যে সকল বিষয়ের কোন দলীল-প্রমাণ নেই সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

৬. আরবদেশে খোতবা বিশুদ্ধ আরবীতে হওয়া দরকার এবং অশুদ্ধ কথ্য ভাষা পরিহার করা উচিত। অনারব দেশে খোতবার ভূমিকা ও রোকনগুলো আরবী হলেই যথেষ্ট। তবে খোতবার বিষয়বস্তু শ্রোতাদের নিজস্ব বোধগম্য ভাষায় হওয়া দরকার।

৭. খোতবা দানের সময় শব্দ ও ভাব-ভঙ্গী স্বাভাবিক হওয়া দরকার। চীৎকার, কৃত্রিম আওয়াজ ও গানের সুরে খোতবা যেন না দেয়া হয়।

৮. খোতবা যেন এই পরিমাণ দীর্ঘ না হয় যে, শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে পড়ে কিংবা এত সংক্ষিপ্ত না হয় যে, বিষয়বস্তু ঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

৯. দুই ঈদের খোতবার মূলনীতিও জুমার খোতবার বর্ণিত মূলনীতির অনুরূপ। তবে তাতে ব্যাপকতা থাকতে হবে এবং ইসলামের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ করতে হবে। [১]

---

১. আমাদের দেশগুলোতে বই দেখে যে খোতবাহ দেয়া হয় তা উল্লেখিত প্রয়োজনের অংশ বিশেষও ভালভাবে পূরণ করতে পারে না। কেননা, সেগুলো স্থানীয় ইমামের তৈরি নয় এবং তাতে সমসাময়িক প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। তাছাড়া তা আরবীতে হওয়ায় শ্রোতারা কিছু বুঝতে পারে না। ফলে খোতবার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

চতুর্থ

মসজিদ সম্মেলন 'মসজিদের পয়গাম বা ভূমিকা' পর্যায়ে যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেগুলো হচ্ছে,

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার ইসলামী তৎপরতার সাথে খাপ খাইয়ে দাওয়াতে দীনের উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং সময়ে সময়ে সেগুলোর পর্যালোচনা করা। ময়দানী অভিজ্ঞতা ও তৎপরতার আলোকে কর্মসূচীতে নতুনত্ব আনা।

২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করা, যাতে করে নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় মসজিদ ও দাওয়া বিভাগ একই লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

৩. মসজিদের সাথে প্রচার মাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন করা দরকার। যাতে করে সকল মাধ্যম ও সংস্থার ইসলামী আকীদার খেদমত এবং শরীয়াহর আলোকে মানুষের আচরণ সুন্দর ও সুষ্ঠু করতে সক্ষম হয়।

৪. মসজিদ নির্মাণের সময় বিভিন্নমুখী সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার যেন মুসল্লীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয়।

৫. দাওয়াতে দীনের মাধ্যমকে বিভিন্নমুখী করা এবং লিখিত জিনিস এবং শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা। (বর্তমান যুগে পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, রেডিও, টেলিভিশন ও ফিল্ম অন্যতম উপায়।)

৬. যেখানেই একদল লোকের সমাবেশ হয় সেখানেই মসজিদ দরকার। যেমন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, কল-কারখানা, ক্লাব, সেনানিবাস ইত্যাদি স্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে এর পয়গাম সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের মধ্যে পৌছাতে হবে।

৭. মসজিদে যুব সমাজের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তাদের মন-মানসিকতার আলোকে যুগোপযোগী পদ্ধতির মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশ করতে হবে।

৮. নারীদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং তাদেরকে তাদের সাংস্কৃতিক অধিকারসহ অন্যান্য প্রাপ্যের বিষয়ে সাহায্য করতে হবে।

৯. প্রত্যেক অঞ্চলে ইমামদের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠান দরকার যাতে তারা নিজেদের বাস্তব সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করে এর উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

১০. জামে' যাইতুনাহ, জামে' কারওইন এবং জামে' আযহারসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক মসজিদের অনুরূপ ভূমিকা পুনরুজ্জীবিত করা এবং সে সকল মসজিদের শিক্ষামূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখা।

১১. ইমাম ও সহকারী ইমাম তৈরি করা। কেননা, মসজিদের পয়গাম ও ভূমিকার বিরাট অংশ এর ওপর নির্ভরশীল।

১২. মসজিদ তৈরি ও প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনায় যেন মসজিদের মূল লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়।

১৩. মুসলমানদেরকে মসজিদে আকসা এবং মসজিদে ইবরাহীমসহ অন্যান্য পবিত্রস্থান মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১৪. ইমামের চিন্তা ও বাক শক্তির স্বাধীনতা থাকতে হবে। তিনি যেন শরীয়াহর আলোকে মুসলিম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

পঞ্চম

মসজিদ সম্মেলন মসজিদের তত্ত্বাবধানের বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে :

সরকারী কিংবা বেসরকারী মসজিদ যাই হোক না কেন, এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এর পয়গাম ও ভূমিকার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি তদারক কমিটি দরকার। সেই কমিটি নিম্নোক্ত কাজ করবে :

১. (ক) নির্দিষ্ট সময়ে নামায অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা এর তদারক করা।

(খ) মসজিদের এলাকার লোকদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা, তাদেরকে সাহায্য করা, জামায়াতে নামায পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসা।

(গ) চাঁদা সংগ্রহ করে তা দিয়ে মসজিদের প্রয়োজন পূরণ এবং অভাবী মুসল্লী ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করা।

(ঘ) মসজিদের মুসল্লীদের থেকেই কমিটি গঠন করা।

(ঙ) পাড়া ও মহল্লাবাসীর সাথে পরামর্শক্রমে কমিটি মসজিদের ইমাম নিয়োগ করবে।

২. গ্রাম, শহর ও জাতীয় কমিটির মধ্যে সমন্বয় থাকা, যাতে করে বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের সাথে সহযোগিতা করা সম্ভব হয়।

ষষ্ঠ

সম্মেলনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 'বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিল' নামক একটি সংস্থা গঠন করা হবে। সংস্থার লক্ষ্য হবেঃ

১. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন ইসলামী বিষয় ও মুসলিম সমস্যার সমাধানের জন্য সাধারণ মুসলিম জনমত গঠন করা।

২. মুসলমানের জীবন থেকে বিভ্রান্ত চিন্তা ও আচরণ দূর করে সঠিক আকীদা–বিশ্বাস ও আচরণের ভিত্তিতে মুসলিম ব্যক্তিত্ব তৈরি করা।

৩. কুরআন ও সুন্নাহর আওতায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ইমাম ও আল্লাহর পথের দায়ী'দের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা, তাদেরকে যুলুম–নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মসজিদের ভূমিকা পালনে সাহায্য করা।

৪. মসজিদ কিংবা এর সম্পত্তির ওপর যে কোন আগ্রাসনের মোকাবিলা করা অথবা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা রোধ করা এবং মসজিদকে আগ্রাসনমুক্ত করে তার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া, যেমন তুরস্কের আয়াসুফিয়া মসজিদসহ অন্যান্য মসজিদ।

৫. ওয়াকফ সম্পত্তির হেফাজত করা এবং বেকার ও হকুমদখলকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করা।

৬. মসজিদে সংখ্যালঘু মুসলমানদের দীনী অধিকার ও অনুষ্ঠান পালনে প্রতিরক্ষা এবং তাদের বিভিন্ন কষ্ট বন্ধ করার চেষ্টা করা।

সপ্তম ঃ কর্মসূচী–

১. শিক্ষা, ওয়াজ, দাওয়াতে দীন ও সামাজিক সেবার উদ্দেশ্যে মসজিদের ভূমিকার পুনরুজ্জীবনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

২. ইমাম ও খতীবের সাংস্কৃতিক এবং কার্যকর যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'রেসালাতু আল–মসজিদ' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করা এবং তাতে কুরআন ও হাদীসের সমর্থিত উঁচু মানের কিছু শিক্ষামূলক খোতবা লেখা।

৩. ইসলামের সৌন্দর্য ও মূলনীতির ওপর কিছু বই–পুস্তক প্রকাশ করা।

৪. (ক) পবিত্র মক্কা নগরী থেকে 'মসজিদের ভূমিকা' শীর্ষক শক্তিশালী বেতার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচার করা।

(খ) প্রত্যেক মুসলিম দেশের বেতার থেকে 'মসজিদের ভূমিকার' ওপর প্রোগ্রাম প্রচারের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা।

(গ) প্রত্যেক মুসলিম দেশ থেকে খৃষ্টান বেতার বন্ধের চেষ্টা করা এবং তা মুসলমানদের দাওয়াতী কাজের জন্য হস্তান্তর করার চেষ্টা করা।

৫. বিশ্বের মসজিদগুলোর ব্যাপক সার্ভে করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং পরে তা পত্রিকা কিংবা পুস্তিকায় প্রকাশ করা।

৬. বিশ্বের বিভিন্ন মসজিদে ওয়াজ-নসীহতের জন্য নির্বাচিত একদল যোগ্য বক্তা ও দায়ী' পাঠানো।

৭. মসজিদের ইমামদের জন্য অব্যাহতভাবে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এর মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

৮. প্রত্যেক মসজিদের জন্য একটি তদারককারী কমিটি গঠন করা যা মসজিদ এবং এর সহায় সম্পদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।

৯. ইসলামের শিক্ষা বিরোধী চিন্তাধারা ও আচরণ পদ্ধতি অধ্যয়ন করে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা।

অষ্টম ঃ কাউন্সিল গঠন পদ্ধতি

এক. মসজিদ সম্মেলন, বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের মৌলিক পদ্ধতি বা গঠনতন্ত্র তৈরির জন্য একটি প্রতিষ্ঠা কমিটি গঠন করবে এবং এরপর থেকে তাদেরকে 'পরিষদ সদস্য' বলে আখ্যায়িত করা হবে। তাদের সদস্যপদের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ থাকবে। মুসলিম বিশ্বের নিম্নোক্ত সেরা জ্ঞানী-গুণী, আলেম, পণ্ডিত, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদেরকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা কমিটি গঠিত হয় এবং তারাই সম্মেলনের সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ঃ

১. আবদুল হালিম মাহমুদ— প্রাক্তন শেখুল আযহার, মিসর।

২. শেখ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায— সৌদী আরবের ইসলামী গবেষণা, দাওয়াহ, ওয়াজ ও ফতোয়া বিভাগের প্রধান এবং রাবেতা আলমে ইসলামীর সভাপতি।

৩. শেখ আবদুল্লাহ বিন হোনাইদ— সাবেক প্রধান বিচারপতি, সৌদী আরব। (তিনি ইন্তেকাল করেছেন।)

৪. শেখ মুহাম্মাদ সালেহ আল—কাজাজ- রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রাক্তন মহাসচিব।

৫. ডঃ মারুফ আদ–দাওয়ালিবি— বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

৬. আবদুল্লাহ আল–আলী আল–মোতাওয়া- মহাসচিব জমিয়াতুল ইসলাহ আল–এজতেমায়ী', কুয়েত।

৭. মেজর জেনারেল মাহমুদ শীত খাত্তাব— ইরাক, রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা কমিটির সদস্য।

৮. কামেল শরীফ— জর্দান, বিশ্বমুসলিম সম্মেলনের সদস্য।

৯. হাসান খালেদ— লেবাননের মুফতী।

১০. আবদুল মজীদ যিন্দানী- ইয়েমেনের ওয়াজ ও এরশাদ বিভাগের প্রধান।

১১. আবুল হাসান আল—নাদভী—ভারত, নাদওয়াতুল ওলামার প্রেসিডেন্ট।

১২. মুহাম্মাদ ইউসুফ— ভারত জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন আমীর।

১৩. তোফায়েল মুহাম্মাদ, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন আমীর।

১৪. ডঃ মুহাম্মাদ নাসের— ইন্দোনেশিয়ার সুপ্রিম দাওয়াহ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট।

১৫. আহমাদ শেখু— ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ব ইসলামী সংস্থার প্রেসিডেন্ট।

১৬. তুন মোস্তফা— মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী।

১৭. ডঃ কামেল বাকের— সুদানের উম্মে দারমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

১৮. আবু বকর গুমি-নাইজেরিয়ার প্রধান বিচারপতি।

১৯. শেখ ইউসুফ নাবহানী— গিনির ইসলামী সংস্থার প্রেসিডেন্ট।

২০. মাহমুদ সাবহী— লিবিয়ার ইসলামী সংস্থার প্রেসিডেন্ট।

২১. মুসা ইবরাহীন— শাদের মুসলমানদের ইমাম।

২২. আহমদ হামানী— আলজেরিয়ার সর্বোচ্চ পরিষদের প্রেসিডেন্ট।

২৩. সালেম আজ্জম— ইউরোপ ইসলামী কাউন্সিলের মহাসচিব।

২৪. আহমদ সাকার— আমেরিকার রাবেতার পরিচালক।

২৫. দাউদ আসআ'দ— আমেরিকান ইসলামিক এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।

২৬. শফিকুর রহমান— দক্ষিণ আমেরিকান সংস্থা আলাসগার প্রেসিডেন্ট।

দুই. প্রতিষ্ঠা কমিটির সদস্যরা নূতন সদস্য মনোনয়ন দিতে পারবেন।

তিন. রাবেতার সাধারণ সচিবালয়ে বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের একটি দফতর কায়েম করা হবে।

নবম : মসজিদের অর্থ সংস্থান

মসজিদ সম্মেলন মসজিদের আর্থিক যোগানের বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ করে :

১. সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারী অনুদান।

২. ধনী লোকদের দান।

৩. এ উদ্দেশ্যে ধনীদের সুপারিশ।

৪. মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি।

৫. জাতীয় ইসলামী সংস্থাগুলোর দান।

৬. অর্থ তহবিলের পক্ষ থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগ প্রকল্প।

৭. মসজিদের চাঁদা সংগ্রহ ও ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে অর্থ তহবিল গঠন।

৮. বিশ্বের মসজিদগুলোর প্রয়োজনের সাথে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্ব মসজিদ সুপ্রিম কাউন্সিল একটি তহবিল গঠন করবে।

৯. বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের দায়িত্ব হল চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করা, যেন এক মসজিদে বারবার চাঁদা না আসা এবং অন্য মসজিদে মোটেও চাঁদা না যাওয়ার বিষয়ে তদারক করা।

বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয় :

১. মসজিদ সম্মেলনের ব্যয়সহ বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের যাবতীয়

ব্যয় বহন করবে সৌদী আরব এবং রাবেতার সহযোগিতায় সম্মেলন আহবান করা হবে।

২. সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ও বিশ্ব সুপ্রিম মসজিদ কাউন্সিলের কার্যাবলীর ব্যয় কেন্দ্রীয় মসজিদ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

৩. প্রত্যেক দেশের স্থানীয় মসজিদগুলো নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যয় নির্বাহ করবে ঃ

(ক) মসজিদের সংশোধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে ওয়াকফ মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও স্থানীয় মসজিদ কমিটি এতে সাহায্য করবে।

(খ) সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওয়াকফ মন্ত্রণালয় মসজিদের ইমাম, খতীব ও মোয়াযযিনসহ অন্যান্য কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করে থাকে। এ ছাড়াও একই মন্ত্রণালয় মসজিদের সাজ-সরঞ্জাম ও বিছানার ব্যবস্থা করে। স্থানীয় অর্থ তহবিল থেকে মসজিদে আলোচনা, রেকর্ডিং, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য কাজগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিলের সহযোগিতাও থাকবে।

দশম

মসজিদের প্রকৌশলী পরিকল্পনার ব্যাপারে সম্মেলন যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. মসজিদকে মুসলিম সমাজের কেন্দ্র বিবেচনা করা উচিত। কেননা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য দীনী দায়িত্ব-কর্তব্যেরই সম্প্রসারণ। তাই মসজিদ গ্রাম ও শহরের কেন্দ্রস্থলে হওয়া দরকার।

২. মসজিদের ডিজাইন সহজ-সরল ও সাদা-মাটা হওয়া এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তবে নির্মাণ কাজে আধুনিক প্রকৌশলী উপায় উপকরণ প্রয়োগ করা দরকার।

৩. মসজিদ নির্মাণের সময় মুসলিম সমাজের নিম্নোক্ত সাধারণ বিষয়গুলো বিবেচনা করা দরকার।

(ক) মসজিদ স্বাস্থ্যকর স্থানে এবং উপযুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে নির্মাণ করা দরকার।

(খ) মহিলাদের জন্য পৃথক নামাযের স্থান তৈরি করা প্রয়োজন যাতে পুরুষদের সাথে তাদের মিশ্রণ না হয়।

(গ) মসজিদে লাইব্রেরী, রিডিং রুম ও হল রুম থাকা দরকার।

(ঘ) মসজিদে কুরআন শিক্ষার স্থান এবং ছাত্রদের লেখা–পড়ার সাহায্যের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(ঙ) মসজিদের পার্শ্বে খেলার মাঠ। শিশুদের যত্নকেন্দ্র এবং ছুটিকালীন বিনোদনকেন্দ্র থাকা দরকার।

(চ) মসজিদে নারী শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

(ছ) ছোট–খাট চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং মুর্দাদের গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

(জ) মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাকারী পরিবেশ বিরোধী কোন জিনিস যেন পার্শ্বে না থাকে।

(ঝ) অতিথিশালা থাকা দরকার।

৪. (ক) রাবেতা আলমে ইসলামী মুসলিম বিশ্বে মসজিদ তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে উৎসাহিত করবে যেন তারা মসজিদ কমিটিকে উন্নত করে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ডিজাইন তৈরি করে।

(খ) রাবেতা আলমে ইসলামী মসজিদের সুন্দর ডিজাইনের জন্য মুসলিম নির্মাণ কৌশলীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

একাদশ

মসজিদে আকসার বিষয়ে সম্মেলন নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণ করে ঃ

১. পবিত্রস্থান উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা শক্তিশালী করা এবং ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে মুজাহিদ দল গঠনের আহবান।

২. পবিত্রস্থান উদ্ধারের লক্ষ্যে মুসলমানদের সকল সম্ভাব্য শক্তি নিয়োগ করা এবং অধিকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের বিপরীত সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা।

৩. মুসলিম তরুণদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া এবং মুসলিম দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উর্ধতন স্তর পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সামরিক শিক্ষাকে শিক্ষা কারিকুলামের বাধ্যতামূলক মৌলিক অংশ করা। এর মাধ্যমে খালেস একদল মুজাহিদ তৈরি করা সম্ভব হবে।

৪. মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতির কাছে মসজিদে আকসার বিষয়টি তুলে ধরা। এটা তখনই সম্ভব যখন এ বিষয়ে মসজিদের

মিম্বার ও শিক্ষা কারিকুলাম কথা বলবে এবং প্রচার মাধ্যমগুলো সহযোগিতা করবে।

৫. কোন দেশ যদি মসজিদের মর্যাদাহানি করে, এর বিরুদ্ধে সবাইকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে এবং সরকারের রক্তচক্ষু ও শাস্তিকে ভয় না করে মোকাবিলা করতে হবে।

৬. রাবেতা আলমে ইসলামী ভিত্তিক আল-আকসা মসজিদ কমিটি গঠন করে উপরোক্ত প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করা দরকার।

দ্বাদশ ঃ সাধারণ প্রস্তাবাবলী

১. সকল মুসলিম দেশের প্রতি ইসলামী আইন কায়েমের আহবান।

২. তুর্কী সরকারের প্রতি আয়া সুফিয়া জামে' মসজিদ খুলে দিয়ে তাতে ইবাদাতের সুযোগদানের আহবান জানানো হয়। কেননা, বিজয়ী বীর মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ কর্তৃক ইস্তাম্বুল জয় করার পর তুরস্কে এটাই মুসলমানদের প্রথম মসজিদ।

৩. রাবেতা আলমে ইসলামী যেন বিশ্বের সকল মসজিদের ওপর একটা বিশ্বকোষ তৈরি করে এবং তাতে গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত করে।

৪. মুসলিম সরকারগুলো যেন ভিন্ন দেশে মুসলিম ছাত্রদের পৃথক থাকার ব্যবস্থা করে, মুসলিম ছাত্রীদের ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং তাদেরকে যেন কোন অবস্থায় মাহরাম ব্যক্তির সাহচর্য ছাড়া পাঠানো না হয়।

৫. সম্মেলন শেষে তাতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। তারা আশা করেন যে, মুসলিম সরকার ও জাতিগুলো যেন মনে করে যে, মসজিদের পয়গাম মূলত ইসলামেরই পয়গাম।

মসজিদে দুনিয়াবী কথা ও কাজ করা

মসজিদে কি দুনিয়াবী কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম জায়েয আছে? যদি জায়েয না থাকে, তাহলে, সেখানে কিভাবে দুনিয়াবী তৎপরতা চালানো যাবে?

এই প্রশ্নের জওয়াব হল, আমরা তো দুনিয়াতেই বাস করি। হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الاٰخِرَةِ 'দুনিয়া হচ্ছে

আখেরাতের কৃষি খামার।' এখানে যে যত বেশী উৎপাদন করবে, পরকালে সে ততবেশী ভোগ করবে। মসজিদ দুনিয়ারই অংশ বিশেষ। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরকালের ফসল বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে হবে। যারা ঐ প্রচেষ্টা চালাবে না, উল্টো তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অপরদিকে, যে কাজ মসজিদে জায়েয নেই, সেই কাজ মসজিদের বাইরেও জায়েয নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য জায়েয হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে করা যাবে না। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধ আছে। এ ছাড়া অন্য সব জায়েয কাজ মসজিদে আঞ্জাম দেয়া যাবে। পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ কাজ সকল স্থানেই নিষিদ্ধ, চাই মসজিদেই হোক কিংবা বাইরে হোক।

মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ করা যাবে না। এগুলো মসজিদের বাইরেও নিষিদ্ধ। মসজিদের ভেতর প্রয়োজনবোধে খানা-পিনা ও বিশ্রাম-নিদ্রা করা যাবে এবং তাতে জ্ঞান চর্চা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজ, সন্ধি ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা সবই করা যাবে। বরং করা জরুরী।

যারা বলেন, মসজিদে দুনিয়াবী কথা বা কাজ করা যাবে না তাদের দাবী অযৌক্তিক ও অর্থহীন এবং মসজিদে নববী সহ অন্যান্য সকল মসজিদের ইতিহাস ও শিক্ষা বিরোধী। এটা তাঁদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও চরিত্রের বিপরীত কোন কথা বলার অধিকার কারুর নেই।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে, অমুসলমান শাসকগণ মসজিদকে শুধু নামাযসহ সীমিত ইবাদাতের জন্য নির্ধারণ করায় বহু সাধারণ মুসলমান মনে করেন যে, মসজিদে ইবাদাত ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে নয়, বরং রসূলুল্লাহ (স)-কেই অনুসরণ করতে হবে এবং পাশাপাশি মসজিদে নববীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক মসজিদের ভূমিকা সামনে রাখতে হবে।

মসজিদে জোরে জোরে ও উঁচু স্বরে কথা বলা যাবে না। আল্লাহর ঘরের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে শান্তভাবে সকল কাজ করতে হবে।

বর্তমান যুগে মসজিদের কি ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত?

ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনেই মসজিদের সৃষ্টি। মুসলমানের ওপর রয়েছে দু' ধরনের অধিকার। ১টা হচ্ছে, আল্লাহর হক বা অধিকার। আর সেটি হচ্ছে তাঁর ইবাদাত করা ও নামায পড়াসহ অন্যান্য আদেশ-নিষেধ মানা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বান্দাহর হক। মানুষের অধিকার পূরণের জন্য রয়েছে মসজিদের বিরাট ভূমিকা। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য মসজিদের রয়েছে বহুমুখী কাজ ও কর্মসূচী।

সমস্যা হচ্ছে, এ সকল ক্ষেত্রে মসজিদ আগে যে ভূমিকা পালন করত, বর্তমান যুগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভাগ সে সকল ভূমিকা পালন করছে। যেমন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারী ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদের বহু করণীয় অন্যান্য স্থান ও প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে মসজিদকে কি সেগুলো পুনরায় করতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রয়োজনীয় কাজগুলো আঞ্জাম দেয়াই বড় কথা। এখন মসজিদের কাজ ও ভূমিকা যদি অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পালন করে এবং সেটা মসজিদের মতই আকাংখিত ও পবিত্র উপায়েই যথার্থভাবে করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সেটা মসজিদের কাজেরই সম্প্রসারণ।

তাই ঐ ক্ষেত্রে মসজিদকে এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন না করলেও চলে। কিন্তু যখন দেখা যাবে যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ঠিকমত ও নির্ভেজাল উপায়ে ঐ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে না, তখনই মসজিদকে পূর্বের আসল ভূমিকায় ফিরে যেতে হবে। তখন ধরে নিতে হবে যে, মসজিদের ভূমিকা অন্য জায়গায় সম্প্রসারিত হয়নি। তখন সে অবস্থার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো মসজিদের অবশিষ্ট যে ভূমিকা পালন করছে না, বর্তমান যুগের মসজিদকে অবশ্যই সেগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। সর্বোপরি মসজিদ নূতন ও কল্যাণমূলক যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে সমাজকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ দেখাতে পারে। মুসলিম সমাজে মসজিদের কোন বিকল্প প্রতিষ্ঠান নেই এবং এটি হচ্ছে মুসলিম সমাজের প্রাণ। তাই যে কোন মুসলিম সমাজকে মসজিদভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের চেষ্টা সার্বজনীন ও চিরন্তন। এ চেষ্টা থেকে কোন মুসলমান দূরে থাকতে পারে না। সমাজের সকল স্থানে বঞ্চনা থাকলেও মসজিদ হবে আশা ভরসার সর্বশেষ কেন্দ্র, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের ভরসার স্থান। কেননা, এটি মানুষের কল্যাণ কেন্দ্র।

কোন মুসলিম সমাজে আল্লাহর দীন কায়েম না থাকলে সে সমাজে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের অনুপস্থিতির কারণে মসজিদকে তার আসল ও পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, এই মসজিদ থেকেই মসজিদের বাইরের অংশে আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে হবে। মসজিদে নববীসহ সকল মসজিদ যেমন করে দীন কায়েম করেছিল। এ ক্ষেত্রে মসজিদগুলো নিষ্ক্রিয় থাকলে গোটা সমাজ আল্লাহর দীনের রহমত থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো যতই মসজিদের বিকল্প ভূমিকা পালন করুক না কেন, তারপরও মসজিদের বহু ভূমিকা অবশিষ্ট থেকেই যাবে। তাই সর্বকালে ও সর্বদেশে এবং সকল পরিস্থিতিতে অবস্থার বিচারে মসজিদকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে। এক কথায় কোন অবস্থাতেই মসজিদকে শুধুমাত্র ইবাদাত বা নামাযের জন্য সীমিত করা যাবে না। এর অসীম ও বহুমুখী ভূমিকাকে স্বীকার করতে হবে এবং একে সমাজ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যাবে না। অর্থাৎ যেখানে ইবাদাত ছাড়া সমাজের মানুষের আর কোন প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকবে না, এমন হওয়া উচিত নয়।

অন্যদিকে, প্রতিটি দেশে রয়েছে অগণিত মসজিদ। স্বয়ং বাংলাদেশেই আছে আড়াই লাখের বেশী মসজিদ। মসজিদের জন্য নির্ধারিত এই বিরাট ভূখণ্ডকে ইবাদাত ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা না হলে ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা অবশ্যই ভূমির অসদ্ব্যবহার হবে। কিন্তু ইসলামে কোন অপচয় নেই। তাই মসজিদে বেশী বেশী তৎপরতা চালাতে হবে। মসজিদকে কিছুতেই খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের উপাসনালয়ের মত সমাজ নিরপেক্ষ করে রাখা যাবে না। অমুসলিমরা পূজা ও উপাসনা ছাড়া তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে আর কোন দুনিয়াবী কাজ করে না। সেটা ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সিনাগগ, গীর্জা, মন্দির ও প্যাগোডার জন্য মানানসই হলেও ইসলামের মসজিদের জন্য মানানসই নয়।

সমাজ সংশোধন ও সংস্কারের জন্য মসজিদ ভিত্তিক পরিবর্তন প্রচেষ্টা কাম্য। মসজিদ ভিত্তিক প্রচেষ্টা মসজিদের বাইরের প্রচেষ্টা থেকে অনেক বেশী কার্যকর ও সফল। যারা মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করেন, তারা আজও সেই সাফল্য নিজ চোখে দেখতে পারেন। অতীতের সকল ইসলামী দাওয়াত, তাবলীগ ও আন্দোলন মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে। তাই তাদের প্রতি জনগণের সাড়াও ছিল সর্বাধিক। যে কোন সংস্কার আন্দোলনকে গণমুখী করতে হলে গণ সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। তাই যেখানে জনগণের আগমন সে জায়গা থেকেই গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর তা হচ্ছে

মসজিদ। যেই দাওয়াতী কাজের সাথে মসজিদের সম্পর্ক বেশী সেই দাওয়াতী কাজের শিকড় জনগণের গভীরে প্রোথিত এবং তা ঝড়-ঝাপটায় মূলোৎপাটিত হবে না। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় বড় ইসলামী দাওয়াতী আন্দোলনগুলো মসজিদকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, অফিস ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ কম সফল ও ব্যয়বহুল। অসংখ্য অফিসের বিরাট আর্থিক বোঝা বহন করতে হয়। অথচ মসজিদ ভিত্তিক কাজে অর্থনৈতিক চাপ নেই। স্বল্প খরচে বেশী কাজ করা সম্ভব।

বর্তমান যুগে মসজিদ নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে

১. কুরআন ও হাদীসের দারস চালু করা। যাতে করে মহল্লাবাসীরা সরাসরি কুরআন-হাদীসের সংস্পর্শে আসতে পারে। কুরআন-হাদীসের শিক্ষার আলোকে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করতে হবে। মোট কথা, সুন্দরভাবে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে হবে, যারা দীনী বা মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি এবং যারা শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা যেন এর মাধ্যমে নিজেদের দীনী জ্ঞানের অভাব পূরণ করতে পারেন। সাথে ফিকহ সম্পর্কিত আলোচনাও করতে হবে যেন মানুষ প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল শিখতে পারে। কেননা, মাসলা-মাসায়েল ছাড়া কোন ইবাদাতই সুষ্ঠুভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। কুরআন ও হাদীসের দারস ধারাবাহিকভাবে বিশেষ কোন তাফসীর ও বিশুদ্ধ ছয় হাদীসগ্রন্থের যে কোন একটা হাদীসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। এক তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ শেষ হলে, অন্য তাফসীর ও হাদীসগ্রন্থ শুরু করতে হবে। দারসের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে, যাতে বেশীর ভাগ লোক তাতে উপস্থিত থাকতে পারে। এ কথা সত্য যে, অজ্ঞতা ও ফাসেকীর অন্ধকার দীনী জ্ঞানের আলো ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞান বিস্তারের ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে। সময় বেশী নেয়া যাবে না। যেন মানুষ বিরক্ত না হয়।

২. কুরআন হেফজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। পার্শ্বে ছাত্রদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা করলে তারা মসজিদে বসে কুরআন মুখস্থ করতে পারবে। ফলে মসজিদকে হেফজখানা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কোরআন হেফজ করা বিরাট সওয়াবের বিষয়।

৩. তাজবীদ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অধিকাংশ লোক কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে পারে না। তাদেরকে উত্তম তাজবীদসহ বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা দিতে হবে।

৪. কুরআন পড়া শিক্ষা দেয়া। যারা কুরআন পড়তে পারে না, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া যায়। পেশাব নিয়ন্ত্রণকারী শিশুদের জন্য মসজিদকেই ফোরকানিয়া মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে মসজিদের পবিত্রতার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। একবার এক বেদুইন মসজিদে নববীতে পেশাব করে দেয়ায় রসূলুল্লাহ (স) এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এতেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। বয়স্ক লোকদের জন্যও মসজিদে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মসজিদকে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা ইসলামে হারাম এবং জ্ঞান অর্জন করা ফরয। তাই ঐ হারাম থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের মত ফরয কাজ আঞ্জাম দেয়ার উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা দরকার। এতে সমাজ ও দেশের কল্যাণ হবে।

৬. ওয়াজ-নসীহত করা। মসজিদে নিয়মিত ওয়াজ-নসীহতের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ইমামসহ বাইরের বক্তা ও অন্য মসজিদের ইমাম দিয়ে কমপক্ষে সাপ্তাহিক নিয়মিত ওয়াজের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস যেমন, ঈদ, শবেকদর, আশুরা ও মে'রাজ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে লোকদের ঈমান ও আমল মজবুত ও শক্তিশালী হতে থাকবে।

৭. মসজিদে দীনী ও অন্যান্য উপকারী জ্ঞানের বই রাখতে হবে এবং তাতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা মসজিদে বসেই বই পড়তে চায় তারা মসজিদেই পড়বে। আর যারা বই ঘরে ধার নিতে চায় তাদেরকে লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল বই ধার দেবেন ও রেজিষ্টারে নাম ও বিলির তারিখ উল্লেখ করে পরে তা নির্দিষ্ট তরিখে উশুল করতে হবে। লাইব্রেরীর বই যেন না হারায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য মসজিদে একটি আলমারী কিংবা তালাযুক্ত সেল্‌ফ থাকতে পারে। এটা পরিষ্কার যে, লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞান বিতরণের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। একই উদ্দেশ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে তৈরি অডিও-ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৮. মসজিদে সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালানো যায়। ইসলামী গান ও কবিতা আবৃত্তি, ইসলামী নাটক ও ফিল্ম প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

৯. বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম করা যায়। যেমন সামষ্টিক নাস্তা বা খাবার গ্রহণ কিংবা মসজিদের মহল্লার লোকদেরকে নিয়ে বাইরে কোথাও ভ্রমণ কিংবা পর্যটনে যাওয়া ইত্যাদি।

১০. মহল্লার মুসল্লীদের বাড়ীতে সামষ্টিক সাক্ষাত ও বেড়ানোর প্রোগ্রাম রাখা যায়। সেখানে হালকা চা-নাস্তারও ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১১. মসজিদের মহল্লার অসচ্ছল মুসল্লীদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে সাধারণ দান, যাকাত ও সাদকা দান এবং আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য ভাল পরামর্শ ও উত্তম সহযোগিতা করা দরকার। মসজিদ কমিটিকে চাঁদা ও দান সংগ্রহ এবং যাকাত ও সাদকাহ সংগ্রহ করে তা বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তুমি যদি নিজে পেটপুরে খাও আর তোমার প্রতিবেশী উপোষ থাকে, তাহলে, তুমি মুসলমান নও।" নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলমান বানানোর উদ্দেশ্যে এ সকল সমাজকল্যাণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১২. মসজিদে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। মহল্লার লোকদের ছোট-খাট রোগ-শোকের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে জন্য এলোপ্যাথিক কোন ডাক্তারকে সপ্তাহের বিশেষ দিনে, যেমন শুক্রবারে মসজিদে বসানো যেতে পারে। এ ছাড়াও হোমিও, হেকিমী কিংবা আকুপাংচারসহ বিভিন্ন চিকিৎসাবিদকে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মসজিদে বসানো যায়। অবশ্য বড় ধরনের রোগ-শোক হলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

১৩. নামাযের সময় মসজিদের মহল্লায় সকল দোকান পাট বন্ধ রাখা এবং সবাইকে নামাযে আসার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া দরকার। দোকানপাট ও বাজার খোলা থাকলে দোকানদার স্বয়ং নিজে নামাযের জন্য মসজিদে আসতে পারে না। এবং খরিদ্দারও একই কারণে আটকে পড়ে। দুর্বল ঈমানদারদেরকে রক্ষার জন্য উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই জরুরী।

১৪. মসজিদ তহবিল গঠন করা। টাকা হলে বহু কাজ করা যায়। অবশ্য টাকা ছাড়াও অনেক কাজ করা যায়। কিন্তু টাকা কাজের জন্য সহায়ক। তাই মহল্লাবাসী, মুসল্লী কিংবা ধনীদের কাছ থেকে সাধারণ চাঁদা কিংবা বিশেষভাবে এককালীন চাঁদা সংগ্রহ করে মসজিদের তহবিল সৃষ্টি করতে হবে। সেই তহবিল থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজসহ মসজিদের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

১৫. মসজিদ কমিটি গঠন করতে হবে এবং মুসল্লীদের ভোটে সৎ লোকদেরকে কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে হবে। কমিটি যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেবে। পৃথকভাবে, মহিলা ও যুবকদের সাব-কমিটি করে তাদের বিভাগীয় কাজ পরিচালনা করা উত্তম।

১৬. চাকুরীসহ বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম সাহেবের চারিত্রিক সার্টিফিকেট গ্রহণ করা উচিত। কেননা, তিনি মহল্লার লোককে ভালভাবে জানেন এবং সততার সাথে সাক্ষ্য দেবেন।

১৭. মসজিদে নারীদের নামায, শিক্ষা, পেশা, চিকিৎসা ও সাহায্যের বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন নারী মসজিদে নামায পড়তে চাইলে কিংবা ওয়াজ-নসীহত শুনতে চাইলে অথবা দীনী জ্ঞান হাসিল করতে চাইলে সে ব্যবস্থাও রাখতে হবে। তাদের জন্য দোতলা মসজিদের উপরতলা কিংবা একতলা মসজিদের এক পার্শ্বে পর্দা দিয়ে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীরা নারীদেরকে শিক্ষা দেবেন কিংবা মাইক থাকলে নারীরা পুরুষের কণ্ঠেও শিখতে পারেন। মসজিদে নারীদের সেলাই শিক্ষাসহ বিভিন্ন গার্হস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া যায়।

১৮. মহল্লার কোন গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে না হলে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যসহ সর্বাত্মক সাহায্য ও পরামর্শ দিতে হবে।

১৯. মহল্লার সকল নেক কাজে সহযোগিতা এবং খারাপ কাজে অসহযোগিতা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং গুনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না।"

২০. নিজ নিজ এলাকায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

"তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

তাই কোন মুসল্লী ও মু'মিন চুপচাপ থাকতে পারে না। তাকে সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে এবং খারাপ ও গুনাহর কাজে বাধা সৃষ্টি করতে হবে ও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে মহল্লার লোকের পক্ষে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, মাস্তানী, মদপান, বেশ্যাবৃত্তি, মাতলামী,

জুয়া, যুলুম-নির্যাতন, উলঙ্গপনা ও খারাপ আচরণের সুযোগ পাবে না। বরং গোটা এলাকার লোক পুরো শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সুখে জীবন যাপন করতে পারবে। প্রথমে বিভ্রান্ত যুবকদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সংশোধন না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাসহ সামাজিক বয়কট করতে হবে কিংবা মহল্লা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। অসৎ কাজের প্রতিরোধ প্রসঙ্গে হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

مَنْ رَاٰى مِنْكُمُ الْمُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -

" তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মন্দ ও অন্যায় কাজ দেখে, সে যেন হাত দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে তার মোকাবেলা করে। যদি তা না পারে তাহলে মুখ দিয়ে এর বিরোধিতা করবে ও জনমত সৃষ্টি করবে এবং সেটাও না পারলে (যেমন কম্যুনিষ্ট বা স্বৈরাচারী শাসনে) অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। তবে অন্তরের ঘৃণা সবচাইতে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।" এ হাদীসে প্রতিরোধের পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে। তাই প্রতিরোধ না করে চুপচাপ বসে থাকলে এবং নিজেকে নিয়ে নিজে সীমাবদ্ধ থাকলে মুসলমান হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

২১. মসজিদের খালি জায়গায় ফলমূল ও শাক-সব্জি লাগানো দরকার। ইমাম ও মুয়ায্যিন তা ব্যবহার করতে পারেন কিংবা তা মসজিদের আয়ের জন্য করা যায়। অনুরূপভাবে কবুতর পালন, মধুর চাষ ও পানির হাউজে তেলাপিয়া সহ বিভিন্ন মাছের চাষ করে মসজিদের আয় বাড়ানো যেতে পারে। ইমাম সাহেবকে এ সব কাজসহ প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে।

২২. খোতবা হচ্ছে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদের বিরাট হাতিয়ার। তাই এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য জাতীয় ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সমন্বিত খোতবার মাধ্যমে একই দিন দেশব্যাপী সর্বাধিক সংখ্যক লোকের কাছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিকল্পিত দাওয়াত পৌঁছানো যায় ও বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান দেয়া যায়। তাই খোতবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বার্ষিক একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রতিমাসে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা যায়। স্মরণ রাখা দরকার যে, খোতবাহ যেন চর্বিতচর্বণ না হয় এবং একই বিষয়ে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করা হয়। খোতবাহ হবে সৃজনশীল ও প্রতিভাধর্মী সৃষ্টি। বই দেখে দেখে

খোতবা পড়লে উক্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। ইমাম ও মুসল্লীর মাতৃভাষায় খোতবা হলেই কেবলমাত্র সবাই উপকৃত হতে পারবে।

জুময়ার খোতবায় এলাকা ও দেশের–দশের সমস্যার কথা আলোচনা করে ইসলামের দৃষ্টিতে সেগুলোর সমাধান পেশ করতে হবে। বিশেষ করে দীনী সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রাধান্য দিতে হবে। এ ছাড়াও স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মুসলিম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা জরুরী। খোতবা হচ্ছে বক্তৃতা ও উপদেশ। তাই প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে পরামর্শ দিতে হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর দীন কায়েমের প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামী আইন–কানুন কায়েমের জন্য সরকারসহ জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং মুসলমানরা যে অন্য কোন মানব রচিত মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না তা বুঝিয়ে বলতে হবে। কেননা, আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোন মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –

"আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে, ইসলাম।"

এ বিষয়টি লোকেরা জানে না বলেই তারা ভুলের মধ্যে আছে। তাদের ভুল ভাঙ্গাতে হবে।"

২৩. প্রত্যেক বছর মসজিদের ভূমিকা ও পয়গাম পুনরুজ্জীবনের জন্য মসজিদ সপ্তাহ পালন করা যেতে পারে। সে উপলক্ষে ইসলামে মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে সকল মসজিদে ব্যাপক আলোচনা করা উচিত। এর মাধ্যমে দেশব্যাপী মসজিদগুলো সচল ও গতিশীল হয়ে উঠবে।

মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রত্যেক বছর মসজিদ সপ্তাহে বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া যায়। তাতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ক্লাব ও স্থানীয় মহল্লা ও পাড়ার ছাত্ররাসহ মুসল্লীরা অংশ গ্রহণ করবে। ফলে, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক' এ হাদীসের স্বার্থক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

২৪. মসজিদের বিভিন্ন তৎপরতা ও আলোচনার মাধ্যমে মুসল্লীদেরকে ধারণা দিতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই মসজিদে ইসলামের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করে মুসল্লীদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতে হবে। কেননা, ইসলামের এই পবিত্র স্থানে এসেও যদি তারা ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না নিতে পারে, তাহলে তারা কোথা থেকে এই জ্ঞান লাভ করবে? তাদেরকে এথেকে বঞ্চিত রাখা যুলুম হবে।

২৫. মসজিদকে দলীয়করণ করা উচিত নয়। বরং তাতে সকল দলের লোকদেরকে জড়িত করা জরুরী। নচেৎ মসজিদের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কেননা, মসজিদ হচ্ছে, মুসলমানের ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্র। এখানে দলাদলির সুযোগ নেই। ইসলামে বিশ্বাসী সকল দলের লোকদেরকে নিয়ে সকল তৎপরতা পরিচালনা করা দরকার। দল বিশেষের নামে তৎপরতা চালালে দ্বন্দ্ব ও কোন্দল দেখা দেবে। তাই দলীয় ভিত্তিতে নয়, সামষ্টিক ও সামগ্রিক ভিত্তিতে সবাইকে নিয়ে মসজিদ কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন করে সকল তৎপরতায় সবার অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করলে সবাই একই দলের অনুসারী হয়ে পড়বে। আর সে দলটি হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসারী দল। আল্লাহ বলেছেন ঃ " তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যেয়ো না।" (আল-কোরআন)

মসজিদের নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্য পদ্ধতি

মসজিদ তৈরির সূচনালগ্নে কোন বিশেষ আকৃতি প্রকৃতি কিংবা ডিজাইন সুনির্দিষ্ট ছিল না। এক টুকরা ভূখণ্ডই ছিল মসজিদের ভিত্তি। কেননা, মসজিদ সম্পর্কে হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যমীনকে আমার জন্যে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।' এমনকি অনেক জায়গায় মসজিদের দেয়াল পর্যন্ত নির্মাণ করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা এক টুকরা যমীনকে চারদিকে পরিখা খনন করে আলাদা করে মসজিদ তৈরি করত। পরিখা খননের উদ্দেশ্য ছিল, অপবিত্র অবস্থায় কেউ যেন মসজিদে না ঢুকে এবং কোন পশুও যেন তাতে বিচরণ করতে না পারে। মসজিদে কোন বেড়া, দেয়াল, ঘর কিংবা ছাদ ছিল না। খোলা আকাশের নীচে মাঠে তারা নামায আদায় করত।

কূফায় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ১৭ হিজরী সালে ঘর ও দেয়াল বিহীন এ রকম একটি মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদের চারপাশে পরিখা খনন করেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইসলাম মসজিদের সাদা-মাটা রূপের বেশী কিছু দাবী করে না।

ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ হচ্ছে মক্কার মসজিদে হারাম। এটিও অনুরূপ খোলা আকাশের নীচে দেয়াল ও ঘর বিহীন অবস্থায় ছিল। কিন্তু যখন মসজিদে হারামের কাছে কোরাইশদের ঘর-বাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং হারাম শরীফে লোকের সংকুলান সমস্যা সৃষ্টি হয়, তখন অপ্রয়োজনীয় ভীড় এড়ানোর জন্য হযরত ওমর (রা) মসজিদে হারামের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করেন। কা'বা শরীফের ঘর প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মসজিদে হারামের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন ঘর ছিল না। মাটিই ছিল মসজিদে হারামের পরিচয়। হযরত ওমর (রা) দেয়াল তুলে মসজিদের সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে মসজিদের কাঁচা ও পাকা ভবন তৈরির পদ্ধতি চালু হয় এবং তা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান আছে। পাকা মসজিদে গম্বুজ তৈরি করা হয়। গম্বুজ ডিমের আকৃতি কিংবা ফুটবলের আকৃতি সম্পন্ন। অধিকাংশ মসজিদে গম্বুজ নির্মিত হওয়ায় তা মসজিদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তা মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও সহায়ক। অবশ্য আজকাল মসজিদে গম্বুজ নির্মাণের পরিমাণ কমে এসেছে এবং মিনারকে মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। মসজিদে গম্বুজ না থাকলেও মিনারা থাকছেই।

গম্বুজ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা রয়েছে। এক ব্যাখ্যায় এটাকে মসজিদের সৌন্দর্য ও ডিজাইনের অংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, গম্বুজের ওপরে তৈরি জানালা থেকে উপরের পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাস মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। এটা মুসল্লীদের স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থেই করা হয়।

যাই হোক, গম্বুজের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গম্বুজ হচ্ছে, মসজিদ গম্বুজে সাখরা। আল-আকসা মসজিদের সাথেই তা অবস্থিত। ২য় গম্বুজ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর কবর মোবারকের ওপর। মিসরের বাদশাহ মানসূর কালাউন আস্‌সালেহীর আমলে ৬৭৮ হিঃ মোতাবেক ১২৭৯ খৃঃ আহমদ বোরহান আবদুল কাওয়ী তা নির্মাণ করেন। তারপর আরব মাগরেবভুক্ত দেশগুলোতে গম্বুজের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। ঐ সকল দেশে গম্বুজকে 'মারবুত' বলা হয়। দেশগুলো হচ্ছে, সিরিয়া, তিউনেশিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং মৌরিতানিয়া। এরপর এশিয়া ও আফ্রিকান মহাদেশের মুসলিম দেশগুলোতেও মসজিদে গম্বুজ নির্মাণ শুরু হয়।

মসজিদের মিনারা তৈরির সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে এই মিনারা নির্মাণের উদ্দেশ্য একাধিক। প্রথমত উঁচু স্থানে উঠে আজান দেয়া। যদিও নীচে আজান দিতে কোন বাধা নেই। তবে উঁচুতে আজান দিলে আওয়াজ বেশী দূরে যায়। ফলে, দূরবর্তী মুসলমানরা তা শুনতে পান ও নামাজের জন্য মসজিদে ছুটে আসেন। আজকাল উঁচু মিনারায় আওয়াজ দূরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাইক্রোফোন লাগানো হয়। ফলে, বহুদূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে। দ্বিতীয়ত মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মিনারা বিভিন্ন আকৃতি ও ডিজাইনের হয়ে থাকে। মক্কার মসজিদে হারাম এবং মদীনার মসজিদে নববীর মিনারার ওপর নতুন চাঁদ খচিত আছে। এগুলোর অনুকরণে মুসলিম বিশ্বের মসজিদের মিনারায় আজকাল ব্যাপক হারে নতুন চাঁদ খচিত হচ্ছে।

মসজিদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, আঙ্গিনা। এটাকে মসজিদের বহিরাঙ্গনও বলা হয়। প্রথম থেকেই মসজিদের আঙ্গিনার প্রচলন রয়েছে। বালাজুরী তাঁর 'ফাতুহুল বোলদান' এবং তাবারী তাঁর 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কুফায় মসজিদ তৈরির সময় প্রথম আঙ্গিনার পরিকল্পনা করা হয়।

মসজিদের ভিতর আলো-বাতাসের প্রাচুর্যের জন্য এই আঙ্গিনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে শহর ও গ্রামের ঘনবসতি এলাকায় মসজিদ তৈরি হলে তাকে স্বাস্থ্যকর করার উদ্দেশ্যে. ঐ আঙ্গিনার প্রয়োজন অনেক বেশী।

অতিরিক্ত ভীরের সময় আঙ্গিনাকে নামাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে ঐ আঙ্গিনায় পানির চৌবাচ্চা ও টয়লেট নির্মাণ শুরু হয়।

ঐতিহাসিক মসজিদগুলোর প্রায় সবগুলোতে প্রথম থেকেই আঙ্গিনা ছিল। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ, তিউনেশিয়ার কায়রোওয়ান মসজিদসহ অন্যান্য মসজিদগুলোর প্রশস্ত আঙ্গিনা ছিল। ঐতিহাসিক আল-মোকরেজী তাঁর 'আল-খোতাত' বইতে লিখেছেন, লোকেরা মসজিদের আঙ্গিনাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করত। জুমআর নামাজ শেষে মিসরের ফোসতাতে অবস্থিত আমর বিন আস মসজিদে পন্যদ্রব্যের কেনা-বেচা হত।

পরবর্তীতে মসজিদের আঙ্গিনায় গাছ লাগানো শুরু হয়। যাতে করে তাতে ছায়া থাকে এবং মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ফিলিস্তিনের ইয়াসমিন মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে ইয়াসমিন ফুলের গাছের নামানুসারে। মদীনার মসজিদে নববীতে ছিল খেজুর গাছ। আঙ্গিনাকে শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত এবং মসজিদের ষ্টোররুম হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ দাবী করেছেন, মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ কৌশলে খৃষ্টানদের গীর্জা, ইহুদী উপাসনালয়, রোমান বাজার ও আদালতভবন এবং পারস্যের অভ্যর্থনা হলের ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে।

খৃষ্টান গীর্জার মডেল ও মসজিদ

এখন আমরা মসজিদ নির্মাণে খৃষ্টান গীর্জার ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করব। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেছেন, মুসলমানরা সিরিয়ান খৃষ্টান গীর্জার অনুসরণে মসজিদ তৈরি করেছে। তাদের অধিকাংশই দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের নজীর পেশ করেন। কেননা, উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক দামেস্কের খৃষ্টান গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন এবং গীর্জার বেশীর ভাগ অংশ অক্ষুণ্ন রাখেন। তাই দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের খুঁটিগুলো খৃষ্টান গীর্জার আকৃতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিন সারি বিশিষ্ট।

বাস্তব সত্য এই যে, দামেস্কের উমাইয়া জামে' মসজিদ খৃষ্টান গীর্জার পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, মসজিদটির পরিকল্পনার উপাদানের সাথে গীর্জার পরিকল্পনার উপাদানের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপভাবে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে সারিবদ্ধ খুঁটি নির্মাণও মসজিদের পরিকল্পনার স্থায়ী কোন নিয়ম নয়। আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, দামেস্কের

জামে' মসজিদ খৃষ্টান গীর্জার অনুরূপভাবে তৈরি হয়েছে, তাহলে মদীনা, বসরা, কুফা, ফোস্তাত ও কায়রাওয়ান সহ অন্যান্য মুসলিম শহরে নির্মিত উমাইয়া মসজিদগুলোও সেরকম হবে। অথচ ঐ সকল মসজিদ দামেস্কের মসজিদ থেকে ভিন্ন ধরনের। পরবর্তিতে যে সকল মসজিদ তৈরি হয়েছে সে গুলো উমাইয়া মসজিদের অনুকরণে নয়, বরং মদীনার মসজিদে নববীর অনুসরণে তৈরি হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদ ও গীর্জার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল, গীর্জার রয়েছে উঁচু দেয়াল, ঘন্টার স্থান ও টাওয়ার। এর ফলে গীর্জা আকাশচুম্বি হয়ে থাকে। অপরদিকে মসজিদ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মসজিদ যমীনের ওপর সাদা-মাটা অবস্থায় সম্মান ও একনিষ্ঠা সহকারে শান্ত বীরত্বের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিকার অর্থে মসজিদের স্থানটুকুর যতটুকু সদ্ব্যবহার করা হয়, অন্য কোন ধর্মের উপাসনার স্থানের ততটুকু সদ্ব্যবহার অবশ্যই করা হয় না। মন্দির ও উপাসনালয় গুলোর বৃহৎ আয়তন, উঁচু দেয়াল, অসংখ্য বাতির আলোকে উজ্জ্বল আভ্যন্তরীণ হল ও বিরাট খালি স্থান যথেষ্ট ব্যয়বহুল। সেগুলোর নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার হচ্ছে, ঠাকুর, ব্রাহ্মণ, পাদরী ও যাজকের হাতে। তারা আবার বিশেষ শ্রেণীর লোক এবং তাদের রয়েছে বিশেষ কমিটি। তারা দর্শনার্থীদের অন্তরে প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টিকারী বিশেষ ধরনের পোশাক পরে। তারা উপাসনা ও পূজায় সুঘ্রাণযুক্ত ধুঁয়া জ্বালায়, বিশেষ ধরনের আলোকসজ্জা করে, গান-বাজনা ও দুর্বোধ্য মন্ত্র ও শ্লোক পাঠ করে। পূজায় বহু অর্থের অপচয় করা হয় এবং বিরাট পরিমাণ খাদ্য নষ্ট করা হয়। মূর্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্য পেশ করা হয় এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। স্বয়ং রকমারি মূর্তি তৈরিতেও বিরাট অংকের অপচয় হয়। ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু-বৌদ্ধ সহ অন্যান্য সকল ধর্মের উপাসনালয়ের ক্ষেত্রে এ অপচয় ও বিলাসিতা প্রযোজ্য।

ইসলামের মসজিদে ঐ সকল অপচয় ও বিলাসিতা নেই। মসজিদ সাধারণত ছোট একখন্ড জায়গার ওপর কায়েম করা হয়। কোন কোন মসজিদ বৃহদাকারেও হয় কিন্তু তাই বলে তাতে অপচয় ও বাহুল্য নেই। মসজিদকে সর্বদা পবিত্র ও পরিষ্কার রাখা হয়। তাতে কেবলার দিক নির্ধারিত থাকে এবং এতে নিয়মিত নামায আদায় করা হয়। যে ভূ-খন্ডের ওপর মসজিদ নির্মিত হয়েছে তা চারদিক থেকে দেয়াল পরিবেষ্টিত থাকে। খুব কম মসজিদই দেয়াল ঘেরা নয়। মেঝেতে, ইটপাথর লাগানো হয় এবং এর ওপর বিছানা কিংবা জায়-নামায পাতা হয়। মসজিদের জন্য সাধারণ ঘর কিংবা পাকা ভবন তৈরি করা হয়। এতে দেয়াল, ছাদ, গম্বুজ ও মিনারা

থাকে। আবার কোন কোন মসজিদে এগুলোর কিছুই বিদ্যমান নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। মসজিদ ছোট হোক কিংবা বড় হোক, মুসলমানের মনে এর বিরাট সম্মান ও শ্রদ্ধা বর্তমান আছে। মসজিদ পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটাকে ঈমান ও বিশ্বাসের কেন্দ্র মনে করা হয়। মূলত মসজিদ হচ্ছে একটি দর্শন ও আত্মার নাম।

দর্শন এই ভিত্তিতে যে, রসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে এই মসজিদের গোড়া পত্তন করেন।

আর আত্মা বলতে বুঝায়, তা ইসলামের আত্মা বা প্রাণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ লাভ করার পর রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ তৈরির পূর্বে তিনি কোন গীর্জা কিংবা মন্দির অথবা মঠের আকৃতি দেখা কিংবা অনুসরণ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

তিনি যে মসজিদ তৈরি করেন, তা খুবই সাদাসিধে ছিল। মসজিদের আকৃতিতে মুসলমানের সঠিক পরিচিতি ফুটে উঠত। পরবর্তীতেও মুসলমানরা মসজিদের একই আকৃতি ও অবস্থা অব্যাহত রাখেন।

খৃষ্টানদের গীর্জা বা গীর্জার অংশ বিশেষকে মসজিদ বানানোর প্রয়োজনটাই বা কি? কেননা, খালি একখন্ড যমীনে মসজিদ নির্মাণ করা এর চাইতে আরো সহজ এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে কারুর অনুভূতিতে কষ্ট দেয়া হয় না। শুধুমাত্র তুরস্কের ওসমানী সুলতানগণ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের যে অংশগুলো জয় করেছেন, সেখানকার গীর্জাগুলোকে মসজিদে রূপান্তর করেছেন। সম্ভবত তা স্পেনের মসজিদগুলোকে মন্দিরে রূপান্তর করার খৃষ্টান কর্মসূচীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিক্রিয়া ছিল। এটা ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায়ের ঘটনা এবং এটা ইসলামের কোন সাধারণ নিয়ম নয়।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ বলেছেন, মসজিদের মূল পরিকল্পনায় গীর্জার সকল বিষয় নয় বরং অংশ বিশেষকে অনুকরণ করা হয়েছে। যেমন, মিনারা, মিম্বার, মেহরাব ও হুজরাহখানা ইত্যাদি। প্রাচ্যবিদদের এ সকল কথার যে, কোন ভিত্তি নেই তা ইতিমধ্যেই আমরা প্রমাণ করেছি। কেননা, মিনারা তৈরি করা হয় আযান দেয়ার জন্য। মিম্বর নির্মাণ করা হয় খোতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে। মেহরাব নির্মাণ করা হয় ইমাম যেখানে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের নামাযের নেতৃত্ব দেবেন। মেহরাব কেবলার দিক নির্দেশক। ইমামের পিছনে সকল মুসল্লী সাম্য ও ঐক্যের নিদর্শন হিসেবে কোন ভেদাভেদ ছাড়াই আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হয়। যেমন সেনাপতি সৈনিকদের সাথে অবস্থান করে

তাদের নেতৃত্ব দেন। ইমামকে মেহরাব ছাড়া অন্য কোন বিশেষ পোশাক বা চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নেই। তিনিও সাধারণ মুসল্লীদের মতই একজন সাধারণ মানুষ। ইসলামে গণতন্ত্রের এই ভিত্তির কারণেই মসজিদগুলোর বিস্তার হয়েছে।

মুসলমানরা মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। মসজিদে গীর্জার অনুরূপ কোন গান-বাজনা, ছবি ও বিশেষ ধরনের তথাকথিত বরকতময় সুগন্ধি বিতরণের ব্যবস্থা থাকে না কিংবা এমন কোন বিশেষ রং ও উপকরণ নেই যা সমবেত লোকদের মনে বিশেষভাবে দাগ কাটতে পারে ও প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ইসলাম ঐ সকল চমকপ্রদ ও চোখ ঝলসানো উপকরণের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রভাবসৃষ্টির পরিবর্তে সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়ার ব্যবস্থা করে। পার্থিব ও জড় উপাদানের প্রভাব সৃষ্টির পরিবর্তে এগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আদেশ-নিষেধ বুঝে তা বাস্তবায়ন করতে পারলেই মনে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি হবে। জড় উপাদানের ইতি ঘটলে জড় প্রভাবেরও ইতি ঘটে। তাই ইসলামে কৃত্রিম প্রভাব সৃষ্টির ব্যবস্থা নেই।

ইহুদী সিনাগগ (উপাসনালয়) মডেল ও মসজিদ

কোন কোন পাশ্চাত্যবিদ মনে করেন, মসজিদের বাঁকা মেহরাবের সাথে ইহুদী উপাসনালয় (Synagogue) এর বক্রতার মিল আছে। অনুরূপভাবে, মসজিদের মিম্বারের সাথে ইহুদী সিনাগগের প্লাটফরমের সাদৃশ্য রয়েছে। মিঃ ল্যামপিয়ার এই মতকে স্বীকার করে বলেছেন, শুধুমাত্র মসজিদের মিম্বরের সাথে সিনাগগের উঁচু আসনের মিল আছে।[১]

মূলত এ সকল মতামতের সত্য কোন ভিত্তি নেই। ইহুদী ধর্মানুসারী লেখক নিজ ধর্মের ব্যাপারে শুধুমাত্র গোঁড়ামীর পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, মসজিদের মিম্বার ও সিনাগগের উঁচু আসনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, মিল থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা, দু'টো জিনিস দু'টো পদ্ধতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

---

১. মাওখাল ইলা মাসাজিদিল কাহেরো ওয়া মাদারিসেহা- ২৮৯ পৃঃ

পারস্যের রাজ প্রাসাদের অভ্যর্থনা কক্ষ ও মসজিদ

পাশ্চাত্যবিদ ক্রেজওয়েলের মতে, মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ পদ্ধতি দু'টো। একটি হচ্ছে, সিরিয়ার খৃষ্টান পদ্ধতি এবং অন্যটি হচ্ছে, ইরাকের গৃহীত পারস্য রাজপ্রাসাদের অভ্যর্থনা কক্ষ পদ্ধতি। পারস্য রাজপ্রাসাদের অভ্যর্থনা কক্ষ ছিল চারকোণ বিশিষ্ট। মসজিদেরও রয়েছে চারকোন। ক্রেজওয়েল এর ওপর ভিত্তি করে মসজিদ সম্পর্কে ঐ ভ্রান্ত মন্তব্য করেন।[১]

অথচ এটা সবার কাছে পরিষ্কার, ইরাকের মসজিদগুলোও মদীনার মসজিদে নববীর অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। কেননা, মসজিদগুলোর সাদামাটা রূপ এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তা কোন রাজপ্রাসাদের অনুকরণে তৈরি করা হয়নি।

রোমান বাজার এবং আদালত মডেল ও মসজিদ

প্রাচ্যবিদ সোভাজিয়ার মতে,২ মুসলমানদের মসজিদ রোমাণ বাজার ও আদালতের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। তার মতে, মসজিদ হচ্ছে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিক সভা-বৈঠকের স্থান। এটা মূলত আদালত কক্ষ এবং অস্ত্রাগার ও বাইতুলমালের সমপর্যায়ের। তাই সোভাজিয়া বলেছেন, মসজিদের এ ভূমিকার সাথে রোমান অভ্যর্থনা কক্ষের মিল রয়েছে, তিনি আরো বলেছেন, এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, অভ্যর্থনা কক্ষ বিশেষ লোকদের জন্য এবং মসজিদ হচ্ছে সাধারণ লোকদের জন্য।

বাস্তবতা হচ্ছে এ যে, সোভাজিয়ার এ মতটি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। তিনি মসজিদের মূল কক্ষকে উপেক্ষা করেছেন। অর্থাৎ রোমান অভ্যর্থনা কক্ষ ও মসজিদের কক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

মূল কথা হল, মুসলমানদের মসজিদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক ও নিজস্ব। এটা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা উপাসনালয়ের পদ্ধতি থেকে ধার করা নয়। ইসলামের পূর্বে মসজিদের এ আকৃতি ও ডিজাইন কোথাও ছিল না। তাই পাশ্চাত্যবিদদের ঐ সকল মনগড়া কথার কোন যৌক্তিকতা নেই। মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিজস্ব শক্তি ও প্রতিভার ভিত্তিতে ঐ নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

---

১. মাওখাল ইলা মাসাজিদিল কাহেরো ওয়া মাদারিসেহা- ২৮৯ পৃঃ

২. ঐ

উপসংহার

মসজিদ হচ্ছে, আল্লাহর ঘর। যমীনে এর চাইতে পবিত্র স্থান আর নেই। এ ঘরের নিয়মিত আবাদকারীরাই এর বাসিন্দা। তারা ক্ষমা, রহমত এবং কল্যাণের স্রোতে অবগাহন করছে প্রতিনিয়ত। তাই মসজিদের সাথে প্রতিটি মুসলমানের নিয়মিত সংযোগ অত্যন্ত জরুরী।

মসজিদ যেহেতু সকল নেক ও ভাল কাজের উৎস, তাই সেখানে নামায শেষে তালা ঝুলিয়ে রাখলে চলবে না। মসজিদকে তার মূল ধারা ও ভূমিকায় পুনর্বহাল করতে হবে। তাহলেই আমরা মসজিদের সকল নেয়ামত ও ফযীলত লাভ করতে পারবো।

কিন্তু মসজিদের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান যুগের মসজিদ তার প্রথম দিনের ভূমিকা,লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। মসজিদে নববীসহ প্রথম যুগে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ থেকে বর্তমান যুগের মসজিদগুলো অনেক পেছনে সরে এসেছে এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমিত ভূমিকা পালন করছে।

আজ মসজিদকে তার সাবেক ভূমিকায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন খালেস ও নিরলস উদ্যোগ এবং পর্যায়ক্রমিক যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ। দেশের ওলামা সমাজ ও ইসলামী সংস্থাগুলোকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের পুরো জনশক্তিকে মসজিদের আওতায় নিয়ে আসার বৃহত্তর পরিকল্পনা নিতে হবে।

লেখকের অন্যান্য বই

১. মক্কা শরীফের ইতিকথা

২. মদীনা শরীফের ইতিকথা

৩. আল–আকসা মসজিদের ইতিকথা

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে গান–বাদ্য ও ধূমপান

৬. ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৭. ভাল মৃত্যুর উপায়

৮. রমজানের তিরিশ শিক্ষা

৯. কালেমা শাহাদাত এক বিপ্লবী ঘোষণা (অনুবাদ)

১০. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা "

১১. মদ, যেনা ও সমকামিতার পরিণাম "

১২. ইউরোপে ইসলামের আলো—বসনিয়া–হারজেগোভিনা